অক্টোবর-ডিসেম্বর 1996

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

অষ্টাদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর 1996 দাম পাঁচ টাকা

এই সংখ্যায় :

ধর্ম আর বিজ্ঞানের সম্পর্ক
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ ও সংকট
ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স সম্পর্কে প্রতিবেদন
পরিবেশের বর্জ্য-শোধন
এক প্রতিবাদী চিকিৎসকের কাহিনী
আচার্য নিয়ে সঙ্কট
নিউক্লিয়ার এনার্জির সাম্প্রতিক কথা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ 18 সংখ্যা 4
অক্টোবর-ডিসেম্বর 1996

সূচীপত্র

আমাদের কথা 1
ধর্ম ও বিজ্ঞান 2
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ ও সংকট 5
ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স —
একটি স্বপ্নের অপমৃত্যু' 11
বিষয় : পরিবেশ
বর্জ্য শোধন 16
সততার খেসারত 20
পরিক্রমা :
বিশ্বভারতীর আচার্য সঙ্কট 23
নিউক্লিয়ার এনার্জির হাল হকিকৎ 24

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
P 252, লেকটাউন, ব্লক A,
কলকাতা 700089

আমাদের কথা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর আঠারো বছর পূর্ণ হলো। নানা বাধা-বিপত্তি অনিয়ম নিয়েও আঠারো বছর পার করাটা — বড় বিস্ময় লাগে — নিজেদেরই কাছে। আবহাওয়া বড়ই প্রতিকূল। কিন্তু বয়স আঠারো তো, তাই দুর্মর আশা — সব খারাপ সময়েরই শেষ আছে। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামেই জীবনের জয়যাত্রা। *বি ও বি-র* আঠারো কী প্রতিশ্রুতি বয়ে আনছে তা পাঠকেরই বিচার্য। তবে বিগত কয়েকটি সংখ্যায় আমরা পর পর যে কথা বলার প্রয়াস পাচ্ছিলাম — সবকিছু নতুন করে, নির্মোহভাবে পর্যালোচনা করে দেখা দরকার — এবং এটা একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া — সেদিকেই এগোবার চেষ্টা করছি আমরা।

যে কোনো ব্যাপারেই চটজলদি একটা অবস্থান ঠিক করে নেওয়ার রাজনৈতিক দায় যদিও আমাদের নেই, কিন্তু সমাজ ও বিজ্ঞানের চলমান মিথস্ক্রিয়া অনুধাবন করতে গেলে জীবন্ত ও জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যাগুলোকে পাশ কাটিয়েও যাওয়া চলে না। 'অপারেশন সূর্যোদয়' তেমনি এক জ্বলন্ত ব্যাপার।

সূর্যোদয়ের প্রত্যাশী তো আপামর সকল মানুষ। এমনকি উৎখাত হওয়া হকাররাও। কলকাতা মহানগরীর ক্ষীণ রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে বাণিজ্য চলুক অথচ পথচারী রাস্তার ওপরে হাঁটতে গিয়ে জীবন বিপন্ন করুক, যানজট স্থায়ী হোক, কোনো নাগরিকই তা চান না। কিন্তু অন্য নানা প্রশ্নেরও সদুত্তর থাকাও জরুরি। কেন এত তড়িঘড়ি এভাবে বেশ কিছু মানুষের রুটি রুজির পথ বন্ধ হলো; অন্য কোনোভাবে পরিকল্পিত কিছু পদক্ষেপের সাথে কাজটি করা উচিত বা সম্ভব ছিল কিনা — এ-সব প্রশ্ন পুরনো। ব্যক্তিমালিকের জমিতে দু-একবছর চাষ বা বাস করলেও বর্গার অধিকার যদি জন্মায়, দশবছর সরকারি জায়গায় (ফুটপাথ!) অধিষ্ঠিত থাকলেও কোনোরকম অধিকার কেন জন্মায় না; সূর্যোদয়ের অপারেশনে স্থান-কাল-পাত্র বিচারে বাছাবাছি হয়েছে কি-না বা কিসের ভিত্তিতে— এ-সবও হয়ত নিন্দুকের কূট প্রশ্ন। এতদিন ধরে ফুটপাত জবরদখল করে কারবার চলছিল কোন ভরসায়, কাদের ভরসায়; ভরসা যদি একমুখী না হয় তবে এইসব ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা যাদের ভরসা ছিলেন, এখন তাদের ভরসা কি একদা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না—সেই ব্রিটিশ উত্তরসূরী জন মেজর-রা?— এসবও নিছক অবান্তর প্রশ্ন।

কিন্তু আমাদের কাছে দুটি প্রশ্ন ভীষণই প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে — *এক*, সৎ ও সুষ্ঠুভাবে জীবিকা অর্জনের সহায়তা করার ব্যাপারে রাষ্ট্র তথা সরকারের ভূমিকা হিসেবে 'অপারেশন সানশাইন'-কে মডেল হিসাবে দেখা যেতে পারে কিনা এবং দুই, পরিবেশ দূষণ রোধের তাগিদে সুপ্রিম কোর্ট দিল্লীতে অনতিবিলম্বে মোটরবাইক, অটো তথা গাড়ির সংখ্যা ছাঁটাই করার নির্দেশ দেবার ফলে কি তাহলে দিল্লীতে সূর্যাস্ত ঘনিয়ে আসবে? কারণ 'সূর্যোদয়' অপারেশনের অন্যতম রূপকারের বক্তব্য অনুযায়ী এক বৃহত্তর ও সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ এই 'অপারেশন'। কলকাতার বাইরে ট্রাক টার্মিনাস করে সেখান থেকে হাজার হাজার ছোটো গাড়িতে বাজারে বাজারে মাল দেওয়া নেওয়া করা হবে। তাতে কর্মসংস্থান হবে বহু হাজারের — উৎখাত হকাররা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন!

ধর্ম ও বিজ্ঞান

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

মানবজাতির যা কিছু কীর্তি ও চিন্তা তা সবই জড়িয়ে আছে গভীরভাবে অনুভূত কোনো প্রয়োজন বোধ বা বেদনা উপশমের সাথে। আত্মিক (spiritual) কোনো সামাজিক আলোড়ন ও তার বিকাশকে বুঝতে চাইলে এই কথাটা সব সময়ে মনে রাখতে হবে। যত মহিমান্বিত ছদ্মবেশে ধারণ করেই তারা আসুক না কেন, সমস্ত মানবিক প্রচেষ্টা ও সৃষ্টিকর্মের পেছনে আছে অনুভব ও আকুল আকাঙ্ক্ষা। এখন কোন্ কোন্ অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাসের দিকে — ব্যাপকতম অর্থে — নিয়ে গেছে? সামান্য একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাব যে, ধর্মীয় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার জন্মের পেছনে রয়েছে চূড়ান্ত বৈচিত্র্যে ভরা অসংখ্য ধরণের আবেগ। আদিম মানুষের বেলায় ধর্মীয় ধারণার পেছনে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে ভয় — ক্ষুধা, বন্যজন্তু, অসুস্থতা ও সর্বোপরি মৃত্যুর ভয়। যেহেতু এই স্তরে কার্যকারণ সূত্র (causal connections) সম্পর্কে ধারণা খুবই অবিকশিত অবস্থায় রয়েছে, মানুষের মন কমবেশি তার নিজেরই আদলে এমনসব কাল্পনিক সত্তা সৃষ্টি করে, যাদের ইচ্ছা ও কাজের ওপরই ওইসব ভীতিপ্রদ ঘটনাগুলি নির্ভর করে। এইভাবেই এইসব সত্তার অনুগ্রহ পাবার জন্য একজন এমন সব যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম করবে, যা পুরষানুক্রমে চলে আসা ধারণা অনুযায়ী ওইসব সত্তাকে সন্তুষ্ট করে বা মর্তের মানুষের প্রতি প্রসন্ন করে তোলে। এই অর্থেই আমি এক ভয়ের ধর্মের কথা বলছি। বিশেষ এক পুরোহিত সম্প্রদায়ের জন্ম ও গঠন এই ভয়ের ধর্মকে স্থায়িত্ব দিয়েছে। যদিও তারা এর সৃষ্টিকর্তা সে-কথা বলা চলে না। মানুষ এবং যে-সব সত্তাকে মানুষ ভয় করে, — এই দুইয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করার ছুতোয় পুরোহিতরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ও তারই ভিত্তিতে কর্তৃত্ব গড়ে তোলে। অনেক সময়েই অন্য নানা কারণের ওপর যাদের অবস্থান নির্ভর করছে, এমন কোনো নেতা বা শাসক বা সুবিধাভোগী শ্রেণী, তার ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃত্বের সঙ্গে এই যাজকীয় কাজকর্মেও জড়িয়ে নেয়, যাতে তাদের প্রথমোক্ত কর্তৃত্ব আরও পাকাপোক্ত হয়। অথবা এমনও ঘটে যে, রাজনৈতিক শাসক ও পুরোহিতরা তাদের স্বার্থকে অভিন্ন বিবেচনা করে জোটবদ্ধ হয়।

সামাজিক সম্পর্ক থেকে জাত নানা প্রবণতাও ধর্মকে দানা বেঁধে উঠতে সাহায্য করেছে। পিতা বা মাতা অথবা বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর নেতারা অমর নয়, বা নির্ভুল নয়। পথনির্দেশ, ভালোবাসা ও সহায়তা পাবার আকাঙ্ক্ষা থেকেও মানুষ ঈশ্বরের সামাজিক ও নৈতিক ধারণা গড়ে তোলে। এ হলো সেই বিধাতারূপী (Providense) ঈশ্বর, যে রক্ষা করে, পুরস্কৃত করে বা শাস্তি দেয়। এই হলো সেই ঈশ্বর, যে ভক্তের বিশ্বাসের সীমার ওপর নির্ভর করে ভালোবাসা দেয় এবং গোষ্ঠীবিশেষ বা মানবজাতির প্রাণ বা জীবমাত্রকেই লালন পালন করে, দুঃখে বা অপূর্ণ কামনায় সান্ত্বনা যোগায়, মৃতের আত্মাকে সংরক্ষণ করে। এই হলো ধর্মের সামাজিক বা নৈতিক ধারণা।

ভয়ের ধর্ম থেকে নৈতিক ধর্মে বিকশিত হয়ে ওঠার চমৎকার উদাহরণ, ইহুদি শাস্ত্রসমূহে পাওয়া যাবে। এই বিকাশ 'নিউ' টেস্টামেন্ট'[1]-এও অব্যহতভাবে চলেছে। সমস্ত সভ্য মানুষের, বিশেষত প্রাচ্যের ধর্মগুলি প্রথমত নৈতিক ধর্ম। ভয়ের ধর্ম থেকে নৈতিক ধর্মে উত্তরণ মানুষের জীবনে এক বড় পদক্ষেপ। তা সত্ত্বেও, আদিম ধর্মগুলি সবই ভয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর সভ্যমানুষের ধর্ম একেবারে বিশুদ্ধভাবে নৈতিকতাভিত্তিক, এমন একটা পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা থেকে আমাদের সব সময়েই সর্তক থাকতে হবে। সত্য এটাই যে, সব ধর্মই এই উভয় ধরণের নানারকম এক মিশ্রণ ; তফাৎ এটুকুই যে, সামাজিক জীবনের উচ্চতর স্তরে নৈতিক ধর্মেরই প্রভাব বেশি।

এই সমস্ত ধরণের ধর্মেরই এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো নররূপী (anthropomorphic) ঈশ্বরের ধারণা। সাধারণভাবে

খুব ব্যাতিক্রমী মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এবং ব্যতিক্রমমূলক উচ্চমানসিকতা সম্পন্ন সম্প্রদায়গুলিই একমাত্র এই স্তরের খুব বেশি ওপরে উঠতে পারে। কিন্তু তৃতীয় আর এক স্তরের ধর্মীয় অভিজ্ঞতাও (religious experience) আছে, যা সব রকম ধর্মেই পাওয়া যাবে — যদিও একেবারে বিশুদ্ধ চেহারায় এ খুবই বিরল। আমি একে বলব মহাজাগতিক ধর্মীয় অনুভূতি (cosmic religious feeling)। এই অনুভূতি পুরোপুরিভাবে যার মধ্যে অনুপস্থিত সে-রকম এক ব্যক্তির কাছে এ-অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। কঠিন এই জন্যেই যে, এর সঙ্গে জোড় মেলানো (corresponding) নররূপী ঈশ্বরের কোনো ধারণা পাওয়া যাবে না।

ব্যক্তিমানুষ মানুষের কামনা ও বাসনার অসারতা অনুভব করে ও সাথে সাথেই অনুভব করে প্রকৃতি ও চিন্তার জগতে প্রকাশিত এক মদৎ ও বিস্ময়কর শৃঙ্খলা বা নিয়ম। ব্যক্তিসত্তাকে তার একধরণের কারাগার বলে বোধ হয় এবং সে বিশ্বকে এক অখণ্ড গুরুত্বপূর্ণ একক সত্তাকে তার অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে ধরতে চায়। মহাজাগতিক ধর্মীয় অনুভূতির সূত্রপাত অনেক আগে ধর্মীয় চিন্তা-বিকাশের গোড়ার দিকে দেখা গেছে। যেমন ডেভিডের অনেক স্তোত্র[2] ও ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মে ... এই উপাদান আরও জোরালোভাবে রয়েছে।

সমস্ত যুগের ধর্মীয় প্রতিভাদের বৈশিষ্ট্যই হলো এই ধরণের ধর্মীয় অনুভূতি, যা কোনো গোঁড়ামির তোয়াক্কা করে না এবং মানুষের আদলে গড়া কোনো ঈশ্বরের যেখানে স্থান নেই। কাজেই এমন কোনো ধর্মপ্রতিষ্ঠান নেই যার কেন্দ্রীয় উপদেশাবলী মহাজাগতিক ধর্মীয় অনুভূতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে কারণে সর্বযুগের প্রচলিত ধর্মমত বিরোধীদের (heretics) মধ্যেই কেবল আমরা এমন সব মানুষ দেখতে পাই, যাঁরা এই উচ্চতম ধরণের ধর্মীয় অনুভূতিতে পরিপূর্ণ ছিলেন। বহুক্ষেত্রেই সমসাময়িকদের চোখে এরা কখনও নাস্তিক, কখনও সন্ত (Saint) হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। এই আলোকে দেখলে ডিমোক্রিটাস,[3] আসিসির ফ্রান্সিস[4] (Francis of Assisi) ও স্পিনোজার মতো মানুষরা একে অন্যের খুবই কাছাকাছি।

মহাজাগতিক ধর্মীয় অনুভূতি থেকে যদি ঈশ্বরের কোনো নির্দিষ্ট ধারণা বা ঈশ্বর তত্ত্বের জন্ম না হয় তো কি করে সেই অনুভূতিকে একের কাছ থেকে অন্যের কাছে ব্যক্ত করা যায়? আমার মতে, এই অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলা ও যারা তাকে

একজন মানুষের নৈতিক আচরণের কার্যকর ভিত্তি হওয়া উচিত সহানুভূতি, শিক্ষা, সামাজিক বন্ধন ও সামাজিক প্রয়োজন, ধর্মীয় ভিত্তির এখানে কোনো প্রয়োজন নেই। শাস্তির ভয় ও পুরস্কারের আশা দিয়ে যদি কোনো মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তবে সত্যিই তার দশা খুবই করুণ।

গ্রহণ করতে পারে তাদের মধ্যে এই অনুভূতিকে সজীব রাখাই সাহিত্য-শিল্প ও বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এইভাবেই আমরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে এমন একটা সম্পর্কের ধারণায় পৌঁছই যা প্রচলিত ধারণা থেকে খুবই আলাদা। ঐতিহাসিক দিক থেকে যদি কেউ দেখেন, তো বিজ্ঞান ও ধর্মকে আপসহীন দুই প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখার দিকেই ঝুঁকবেন এবং তার কারণটাও খুবই স্পষ্ট। কার্যকরণ সূত্রের সার্বিক প্রযোজ্যতার সম্পর্কে যিনি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ, তিনি একমুহূর্তের জন্যেও এমন কোনো সত্তার ধারণাকে প্রশয় দিতে পারেন না, যে সত্তা চলমান ঘটনা স্রোতে কোনো রদবদল আনতে পারে — যদি অবশ্য তার কাছে কার্যকারণসূত্র তত্ত্বের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকে। তাঁর কাছে ভয়ের ধর্মের কোনো উপযোগিতা নেই, সমানভাবে সামাজিক ও নৈতিকতার ধর্মও তাঁর কোনো কাজে আসে না। তাঁর কাছে এমন কোনো ঈশ্বর ধারণাতীত যে শাস্তি দেয় বা পুরস্কার দেয়। কারণটা খুবই সহজ। তাঁর ধারণায় মানুষের কার্যাবলী বাইরের ও ভেতরের নানা আবশ্যিকতা (necessity) দিয়ে নির্ধারিত। কাজেই কোনো জড় পদার্থকেও যেমন তার গতির জন্য দায়ী করা যায় না, তেমনই একজন ব্যক্তিও ঈশ্বরের চোখে দায়ী হতে পারে না। এই কারণেই নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করার অভিযোগ বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আনা হয়। কিন্তু এই অভিযোগে সুবিচারের অভাব আছে। একজন মানুষের নৈতিক আচরণের কার্যকর ভিত্তি হওয়া উচিত সহানুভূতি, শিক্ষা, সামাজিক বন্ধন ও সামাজিক প্রয়োজন, ধর্মীয় ভিত্তির এখানে কোনো প্রয়োজন নেই। শাস্তির ভয় ও পুরস্কারের আশা দিয়ে যদি কোনো মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তবে সত্যিই তার দশা খুবই করুণ।

কাজেই এটা সহজেই বোঝা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম

কেন চিরকালই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছে এবং বিজ্ঞান অনুরাগীদের তাড়া করে বেড়িয়েছে। অন্যদিকে আমি এটা জোরের সঙ্গেই বলছি যে, মহাজাগতিক ধর্মীয় অনুভূতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার পেছনের সবচেয়ে জোরালো ও সবচেয়ে মহৎ চালিকাশক্তি। কি বিপুল প্রচেষ্টাও সর্বোপরি অনুরাগ ছাড়া তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের (theoretical success) পথপ্রদর্শনার কাজ সম্ভব নয়, এটা যাঁরা উপলব্ধি করবেন একমাত্র তাঁরাই বুঝবেন যে কত শক্তিশালী আবেগ থাকলে তবেই এরকম কাজের জন্ম হতে পারে। কারণ এ-সব কাজ জীবনের আশু ও ব্যবহারিক দিক থেকে এতই দূরের। জগতের যুক্তিসিদ্ধ চরিত্রে (rationality of universe) কি গভীর আস্থা ও তাকে বোঝার কি আকুল আকাঙ্ক্ষা (যদিও তা এই ব্রহ্মাণ্ডের মাধ্যমে যে মন আত্মপ্রকাশ করেছে তার এক ক্ষীণ প্রতিফলন মাত্র) কেপলার ও নিউটনে নিশ্চিতভাবে ছিল যার বলে বলীয়ান হয়ে তাঁরা বিশ্ব-প্রকৃতির গতির নিয়মসমূহ উন্মোচনের জন্য বছরের পর পছর ধরে কাজ করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে যাঁদের পরিচিতি প্রধানত ব্যবহারিক ফলাফলের দিক থেকে ঘটেছে , তাঁরা সহজেই সেই সব মানুষের মনোভাব সম্পর্কে ভুল ধারণা গড়ে তুলতে পারেন যাঁরা এক সন্দেহপ্রবণ জগতের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় নানা জায়গায় ও নানা কালে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সম মনোভাব-সম্পন্ন মানুষদের পথ দেখিয়ে গেছেন। কিসে এইসব মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং অসংখ্য ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁদের উদ্দেশ্যে অবিচল থাকার শক্তি দিয়েছিল, তার সজীব উপলব্ধি এমন একজনই অর্জন করতে পারে, যে তার নিজের জীবনকেও একই ধরণের লক্ষ্যে নিবেদন করেছে। কেবল মহাজাগতিক ধর্মীয় অনুভূতিই একজন মানুষকে এই শক্তি দিতে পারে। একজন সমসাময়িক ব্যক্তি বলেছেন, আমাদের এই জড়বাদী (materialistic) যুগে নিবেদিত প্রাণ বৈজ্ঞানিক কর্মীরাই গভীরতর অর্থে একমাত্র ধর্মীয় মানুষ। কথাটা অযথার্থ নয়।

1.নিউ টেস্টামেন্ট : বাইবেলের পরবর্তীকালের ভাষ্য। এতে ঈশ্বরকে পরমকরুণাময় পিতা রূপে বর্ণণা করা হয়েছে। প্রাচীনতর ভাষ্যের নাম ওল্ড টেস্টামেন্ট। সেখানে ঈশ্বর রুদ্ররূপে বর্ণিত।

2.ডিভিডের স্তোত্র : খ্রিস্ট জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে ইসরায়েলের রাজা। ইহুদি লোককথায় ইনি ছিলেন এক আদর্শ রাজা যাঁকে এক অনাগত সোনালী ভবিষ্যতের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। নিউ টেস্টামেন্ট-এ যিশুকে এরই বংশধর হিসেবে দাবি করা হয়েছে। এরই নামে প্রচলিত নানা প্রার্থনা ও স্তোত্র, ইহুদি ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের ভেতর হাজার হাজার বছর ধরে চলে এসেছে।

3.ডিমোক্রিটাস (খ্রি: পূ: 460-430) : গ্রিক দার্শনিক, যাকে অনেক সময় 'পদার্থবিদ্যার জনক' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। ইওরোপীয় আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের অনেক আগেই পদার্থের চূড়ান্ত উপাদান হিসাবে অণুর ধারণার সুসংগঠিত রূপ পাশ্চাত্যে এর কাছ থেকে প্রথম আসে।

4.ফ্রান্সিস অফ্ আসিসি : একজন খ্রিস্ট ধর্মভুক্ত ইতালিদেশীয় সন্ত। ত্রয়োদশ শতকের গোড়াতে খ্রিস্টধর্মের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা।

5.স্পিনোজা (খ্রিস্টীয় 1632-1677) : জন্ম আমস্টারডাম (হল্যাণ্ড)-এর এক ইহুদি পরিবারে। মধ্যযুগীয় ইওরোপের ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অন্যতম যুক্তিবাদী পথিকৃৎ দার্শনিক। তিনি এর ওপরে জোর দিয়েছিলেন যে, যে কোনো ঐতিহাসিক দলিলের মতোই ধর্মীয় শাস্ত্রকেও যুক্তিবোধের আলোয় পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ফলে তিনি ইহুদি সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত হন। পিতারূপী বা যে কোনো নররূপী ঈশ্বরের ধারণার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। স্পিনোজার দর্শনে আমরা "ঈশ্বরের জন্য তার বৌদ্ধিক ভালোবাসার " (Intellectual love of God) কথা পাই। লেন্সের কাঁচ ঘষে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। ঈশ্বর নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর রচিত নানা যুক্তিবাদী পুস্তকের জন্য সবরকম ধর্ম সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই তাকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

❑[Albest Einstein. *IDEAS and OPINIONS*, "Religion and Science" [Rupa & Co., p. 36-40] প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। প্রবন্ধটি 1930 সালে লিখিত।

অনুবাদক : **সুভাষ**

অনুবাদে সহায়তা : **ভারতী**

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ ও সংকট

সিদ্ধার্থ রায়

অভিজ্ঞ শিক্ষক সিদ্ধার্থ রায় বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোয় তিনি উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছেন এবং সমাধানের পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে সহমত হোন আর না-ই হোন — শিক্ষার সর্বস্তরে অবক্ষয়ের যেসব দুর্লক্ষণ ফুটে উঠেছে, তাতে যদি আপনিও উদ্বিগ্ন বোধ করেন, তবে আপনিও কলম ধরুন। — সম্পাদকমন্ডলী।

সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পঠনপাঠন, পরীক্ষাপদ্ধতি, প্রশাসন, কর্মসংস্কৃতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উৎকর্ষতা ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র, ও অন্যান্য গণমাধ্যমে নানা আলোচনা হচ্ছে। এবং গণমানসেও বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। রাজনীতিবিদরাও এই সুযোগে নানা কথা বলে চলেছেন। তার মধ্যে অনেক স্ববিরোধী বক্তব্যও আছে। যেমন প্রচার করা হচ্ছে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে ষাটের দশকের শেষে ও সত্তরের দশকের প্রথমদিকে যে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল তা আজ দূর করা হয়েছে। আবার বলা হচ্ছে যে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একদমই কর্মসংস্কৃতি নেই, এগুলি অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। এর জন্য নানা ধরণের আচরণবিধি প্রণয়নের কথা বলা হচ্ছে। এ সম্পর্কে অধিকাংশ আলোচনার শেষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি প্রতিপাদ্যই বারবার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চলেছে — বর্তমানকালের শিক্ষার দুরবস্থার জন্য শিক্ষককুলই মূলত দায়ী। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ, প্রশাসন, শিক্ষকদের ভূমিকা, বাইরের সমাজের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক এই সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রাথমিকভাবে কিছু আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ঘিরে বির্তক চলেছে। একটা প্রায় সর্বজনীন ধারণা এই যে, আমাদের ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে উপযুক্ত করণিক ও যন্ত্রী উৎপাদনের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের এবং সমাজের প্রকৃত কল্যাণে কোনো দিনই বিশেষ কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে নি। স্বাধীনতার পরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেশের এবং সমাজের জন্য প্রকৃতভাবে উপযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য বিগত কয়েক দশকে এদের সাংগঠনিক বিন্যাস, পরিচালনা, প্রশাসন, পাঠক্রম সব কিছুতেই বহু পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে এবং বর্তমানেও তা চলছে। গত দুই দশক ধরে এই ব্যাপারে আমরা যে সব কথা শুনে আসছি সেগুলি হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গণতন্ত্রীকরণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, প্রাসঙ্গিকতা ও দায়বদ্ধতা। এই বিষয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে কিন্তু তাতে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেছে বলেই মনে হচ্ছে। গোটা দেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন আগের চেয়ে আরও বেশি করেই কেরাণীকুলের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে (আমলারাও প্রকৃতপক্ষে সম্ভ্রান্ত কেরানী)। কয়েক দশক আগে, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের যে প্রভাব ও কর্তৃত্ব ছিল, এখন আর তা নেই। আর ব্রিটিশ যুগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি থেকে এমন কিছু মানুষের উত্থান হয়েছিল যাঁরা স্বক্ষেত্রে স্বমহিমায় বিশ্বশ্রেষ্ঠের দরবারে নিজেদের তুলে ধরতে পেরেছিলেন (সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ, যদুনাথ সরকার প্রমুখ)। তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে যে, নিজস্ব প্রতিভাই এদের বিকাশের একমাত্র কারণ, এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ঋণী নয়। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় এদের সৃজনশীলতা বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। প্রতিভার অভাব নিশ্চয়ই এখনও নেই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার সত্ত্বেও প্রতিভার অন্বেষণ ও বিকাশ ঘটানোয় আমরা আজ ব্যর্থ। সত্যিকারের ত্রুটি কোথায়, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।

গত দুই দশক ধরে যে কথাটা বারবার শোনা যাচ্ছে, তা

হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতি করতে গেলে প্রথমেই এদের পরিচালন পদ্ধতিতে গণতন্ত্রের প্রসার আনতে হবে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে, প্রসাসনকে সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রীকরণ করা হয়েছে। শিক্ষণ বিভাগগুলির প্রধানপদে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শিক্ষক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কাজ করছেন, এবং সমস্ত প্রশাসনিক এবং পঠনপাঠন ও গবেষণা সংক্রান্ত সমিতির সদস্যপদগুলি নির্বাচনের সাহায্যে পূরণ করা হচ্ছে, আগের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মনোনয়নের পরিবর্তে। এমন কি উপাচার্য্যও নির্বাচিত হচ্ছেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলেই প্রতীয়মান হবে যে, এই গণতন্ত্রীকরণ আসলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমস্ত নিয়ন্ত্রণ একদল রাজনীতিক ও আমলার হাতে চলে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসভা ও কার্যনির্বাহী সমিতিতে শিক্ষকদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মোট সদস্যসংখ্যার তুলনায় আনুপাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই দুটি সভাতে, বিশেষ করে আইনসভাতে বহিরাগত সদস্যদেরই বিপুল সংখাধিক্য এবং এঁদের অনেকেই হয় সরাসরি সরকার মনোনীত অথবা পদাধিকার বলে সদস্য। বহিরাগত বাকি সদস্যদের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি এ-রকম যে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলিরই এই নির্বাচনে উপযুক্তভাবে অংশগ্রহণ সম্ভবপর, সাধারণ বিদ্যানুরাগীদের মতামত প্রকাশের সুবিধা এখানে খুবই সীমিত। গণতন্ত্রীকরণের আগে এবং বর্তমানেও আচার্য কর্তৃক উপাচার্য মনোনয়নের জন্য তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসভাতে সদস্যরা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রস্তুত করতেন এবং করেন। তবে আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই এটা ঠিক করতেন। আমরা সবাই জানি যে, বর্তমানে পরবর্তী উপাচার্যের নাম সম্বন্ধে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসভার বৈঠক হবার আগেই তা গণমাধ্যমে ঘোষিত হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ ব্যক্তির কাছে এই নাম গ্রহণযোগ্য না হলেও আইনসভার বৈঠকে বহিরাগতরা সংখ্যাধিক্যের জোরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নামটি অনুমোদন করিয়ে নেন। উপাচার্যের মতো অন্যান্য নির্বাচনগুলিও এখন সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি কবলিত। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শিক্ষাগত উৎকর্ষতা, এমন কি যোগ্যতা, এখন আর মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যদের নির্বাচন পদ্ধতিও এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক শিক্ষকদের সমর্থন পেলেই এই সমিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা যায়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই উদ্দেশ্যেই কিছু পৃথক শিক্ষণ বিভাগ খুলে রাজনৈতিক মাপকাঠিতে (শিক্ষাগত নয়) যোগ্যতা বিচার করে সেই সমস্ত বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সর্বস্তরে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ বন্ধ করে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও উৎকর্ষতার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব ঠিক না করলে অধঃপতন অব্যাহত থাকবে।

গণতন্ত্রীকরণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত স্বাধিকারও আজ বিপন্ন। নতুন পদ সৃষ্টি, নতুন বিভাগ খোলা, বিভিন্ন বিভাগ বা অনুষদের পুর্নগঠন, সবকিছুতেই সরকারি অনুমোদন আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। এমন কি বহুক্ষেত্রে যথাযোগ্য নির্বাচন সমিতির মনোনয়নের পরেও শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কোনো যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আমলারা (এবং তাদের পেছনে রাজনীতিবিদ্‌রা) বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নির্বাচন সমিতি কর্তৃক মনোনীত শিক্ষকদের পদোন্নতি হওয়া উচিত কিনা তা ঠিক করবেন — এর থেকে লজ্জা ও অপমানজনক পরিস্থিতি আর কিই বা হতে পারে? এখন আমাদের রাজ্যে একটি উচ্চশিক্ষা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে—তার সভাপতি মন্ত্রী এবং সমস্ত সদস্যরাই সরকার মনোনীত। সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রম এই পরিষদই ঠিক করে দেবে। অর্থাৎ পাঠক্রম পাঠ্যসূচী ঠিক করার অধিকারও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে চলে যাচ্ছে।

গণতন্ত্রীকরণের আগে বিভাগীয় প্রধান, অনুষদগুলির অধ্যক্ষ, উপাচার্য ও অন্যান্য আধিকারিকদের ক্ষমতা এখনকার তুলনায় অনেক বেশি ছিল, এদের বেশ কিছু অংশ স্বেচ্ছাচারী মনোভাবাপন্ন হতেন এবং প্রায়শই ক্ষমতার অপব্যবহার করতেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোই ছিল এদের শক্তির প্রধান উৎস। এছাড়া কেউ কেউ শিক্ষাজগতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করার ফলেও যথেচ্ছাচার করার সুযোগ পেয়ে থাকতেন। এদের স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরোধিতা করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হতো — বহুক্ষেত্রে এই বিরোধিতায় সাফল্যও আসত। এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন — কিন্তু গণতন্ত্রীকরণের ফলে আরও খারাপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

গণতন্ত্রীকরণের পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের সদর দপ্তর ও সরকারি মহাকরণে স্থানান্তরিত হয়েছে। এর ফলে অযোগ্য এবং অপরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির রাজনীতিবিদরা এবং আড়ালে থাকা আমলারা বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত সমস্ত প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসভা ও কর্মসমিতিতে তাদের প্রতিনিধি ও সহযোগীদের মাধ্যমে কার্য্যকর করে চলেছেন। উল্লেখ্য যে, এই সমস্ত ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে কোনো স্বচ্ছ ধারণাই নেই এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় এদের কোনো অভিজ্ঞতা বা দায়বদ্ধতা একেবারেই অনুপস্থিত। কাজেই স্থানীয় নবাবদের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে অব্যাহতি পেতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোম্পানির শাসন চালু হয়ে গিয়েছে। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা যারা করেছেন তাদের মধ্যে অনেকসময় প্রাজ্ঞ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিও থাকতেন। এঁরা গুণীজনের মূল্যায়ন করতে পারতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে শিক্ষাগত অর্থাৎ পঠনপাঠন গবেষণার ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার পোষক, ধারক এবং বাহকের কাজ করতেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রকৃত উন্নতি সাধন হতো। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রক শক্তির প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গিই এমন যে এই সম্ভবনা একদমই নেই। এই শক্তির প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব করা। এর ফলেই আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এখন এই রাজনীতিবিদ্ ও আমলাদের মহলই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য শিক্ষককুলকে দায়ী করে গণমাধ্যমে প্রচার চালাতে শুরু করেছেন।

বাইরের সমাজ যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ভার বহন করছে, সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের উপর সমাজের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত — আজকাল অনেকেই এই মত পোষণ করেন। গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিবিদ, আমলা ও আরও কিছু মুষ্টিমেয় লোক সুকৌশলে এই ধারণাটি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করছেন। কিন্তু বাস্তবে বিশ্ববিদ্যলয়কে বহিঃসমাজের থেকে সব সময়ই একটা দূরত্ব রেখে চলতে হবে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। রাজনীতিবিদ, আমলা ও তাদের অনুগৃহীত বুদ্ধিজীবীরা এখন বাইরের সমাজ নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই সমাজে অসততা, অকর্মণ্যতা ও উৎকর্ষতার অভাব একান্তভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বর্তমান পরিকাঠামোয় এই সমস্ত ব্যাপক দোষত্রুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমানভাবে অনুপ্রবেশ করে চলেছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ক্রমশই নিম্নমুখী। এই ঘটনা বৃহত্তর সমাজের স্বার্থের একান্ত পরিপন্থী। বিশ্ববিদ্যালয় উৎকর্ষতা অর্জন করার পীঠস্থান। সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করবে না, বরং কর্মদক্ষতা ও সততার উচ্চতম আদর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত মানুষরাই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কেই সততা, নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার উচ্চতম মানের ধারক ও বাহক হতে হবে। কিন্তু গণতন্ত্রীকরণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি, অসাধুতা ও কর্তব্যে অবহেলা তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের তুলনায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষার মানও নেমে গেছে। উন্নত দেশগুলির অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সততা ও উৎকর্ষতার ব্যাপারে কোনোরকম আপস করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যায় ও অসততার নির্মম ও দ্রুত দণ্ড হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনভঙ্গকারীদের কেবল ক্ষমা করাই হয় না, প্রায়শই পুরস্কৃত করা হয়। অযোগ্যতা শুধু সহ্যই করা হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অযোগ্যতাকে উৎসাহদানও করা হয়। সবচাইতে নিন্দনীয় ব্যাপার হলো পাঠনপাঠন-গবেষণা ক্ষেত্রে মিথ্যা দাবি করে শিক্ষকরা শাস্তি থেকে কেবল অব্যাহতিই পান না, অনেক ক্ষেত্রে এই মিথ্যা দাবীর ভিত্তিতে তাদের পদোন্নতিও হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও গণতন্ত্রীকরণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে চলে গেছে, আইনভঙ্গকারী ও অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের অধিকাংশই তাদেরই ছত্রছায়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছেন এবং আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাচ্ছেন। তার পরিবর্তে তারা এই রাজনীতিবিদ্ ও আমলাদের কর্তৃত্ব কায়েম করার সুবিধা করে দিচ্ছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বর্হিসমাজের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। বস্তুত চিন্তায় ও কাজে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ হলে এবং বাইরের সমাজের প্রভাবমুক্ত হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে বহির্জগতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মূল্যায়ন করতে পারবে। অতীতে সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বহু ক্ষেত্রেই সমাজের গরিষ্ঠ অথবা প্রভাবশালী মতামতের বিপরীতে নৈতিক অবস্থান নিয়ে অন্যায়কে প্রতিহত করার প্রয়াস নিয়েছে। এই প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ক্ষমতাসীন শ্রেণী

চিরকাল বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে এসেছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনচেতা মানুষদের অপমানিত ও হেনস্থা করবার জন্য এবং কয়েমী-স্বার্থ বলবৎ রাখার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎশৃঙ্খলতা ও অরাজকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। অতীতে বহু দেশে স্বৈরতন্ত্রী শাসকরা অত্যন্ত স্থূলভাবে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। গণতন্ত্রীকরণের বর্তমান রূপ ছদ্মভাবে একই উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হয়েছে।

সমাজের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও এখন বহু প্রশ্ন উঠেছে। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পাশ্চত্যের কয়েকটি প্রাচীন ও বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সমাজের কিছু বিশেষ প্রয়োজন মেটানো। কিন্তু সময়ের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হয়েছে — এখন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র হলো জ্ঞানের বিকাশ। জ্ঞান বিকাশের প্রকরণ প্রধানত দুটি — গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান আহরণ ও শিক্ষণের মাধ্যমে আহরিত জ্ঞানের বিস্তার।

আমাদের দেশে গণমানসে একটা ধারণা আছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হলো নির্দিষ্ট সময়সূচী ধরে বিভিন্ন পাঠ্যসূচীর পঠনপাঠন, নিয়মিত পরীক্ষাগ্রহণ ও ফলপ্রকাশ; বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে গবেষণার ভূমিকা গৌণ। এতে সাধারণ সমাজের বিশেষ উপকার হয় না — শিক্ষকরাই কেবল ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি ও ভূমিকা সম্পর্কে এটি খুবই ভ্রান্ত ধারণা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পঠনপাঠন ও গবেষণাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করেছে। এইজন্যই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত। শিক্ষণ একটি সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া। সমান্তরাল গবেষণা কার্য শিক্ষকদের সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবনীশক্তির বিকাশ ঘটায়, নতুন ভাবনা-চিন্তার মাধ্যমে মনের সজীবতা বজায় রাখে। যে স্তরে কোনো বিষয়ে কোনো শিক্ষক শিক্ষাদান করছেন, তাঁকে সেই বিষয়ে অনেক উঁচুস্তরের জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। কোনো বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি কখনই থেমে থাকে না। সক্রিয়ভাবে গবেষণায় লিপ্ত থাকাটাই সুষ্ঠুভাবে নিজের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করার একমাত্র উপায়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গবেষণার কাজ নিয়মিত ও ব্যাপকভাবে চললে ছাত্ররা তার সংস্পর্শে আসে। এতে তাদের অনুসন্ধিৎসা ও বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের মধ্যে ও এই গুণগুলি ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিতভাবে ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা হয়। সেখানে বার বার দেখা গেছে যে, উচ্চমানের গবেষণায় নিযুক্ত শিক্ষকদেরই ছাত্ররা সফল শিক্ষক বলে মনে করে। উৎকৃষ্ট গবেষণায় সফল ব্যক্তিরাই যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অধিকাংশ উৎকৃষ্ট পাঠ্যবই এর রচয়িতা — এটা কাকতালীয় নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হওয়া একান্ত প্রয়োজন — এই কথা যারা স্বীকারও করেন, তাদের অনেকেরই মনে কী ধরণের গবেষণা হওয়া উচিত তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। অনেকে মনে করেন আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে মৌলিক গবেষণা বিলাসিতা মাত্র — এর যৌক্তিকতা বা প্রাসঙ্গিকতা খুব একটা নেই। কৃষি, শিল্প, কারিগরিবিদ্যা, ঔষধ তৈরি ইত্যাদি ফলিত গবেষণাই আমাদের দেশের পক্ষে উপযুক্ত, প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজন। এ-বিষয়ে কয়েকটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। প্রথমত, গবেষণা মৌলিক হবে বা ফলিত — এটি নিয়ে বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে ধরণের গবেষণাই হোক সেটা যেন উচ্চমানের হয়। উচ্চমানের গবেষণা — সে মৌলিকই হোক, ফলিতই হোক — তা সবসময়ই প্রাসঙ্গিক ও সমাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। কোনো গবেষণার ফল সমাজের পক্ষে সত্যিই প্রাসঙ্গিক কি না সেটা বিচার করাও হঠকারিতা। মনে রাখতে হবে, বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করার সময় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বিদ্যুৎ সমাজের কোনো উপকারে লাগবে কি-না? তখন তিনি বলেছিলেন যে, তার কোনো সম্ভাবনা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। উন্নত দেশগুলির অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক ও ফলিত উভয় ধরণের গবেষণায়ই মানের উৎকর্ষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেইজন্যই সেখানকার গবেষণা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্য সংস্থাও বিশ্ববিদ্যালয়কে নানাভাবে সাহায্য করে আর তার পরিবর্তে এসব গবেষণার দ্বারা উপকৃত হয়।

দ্বিতীয়ত মৌলিক ও ফলিত গবেষণা একে অন্যের পরিপূরক, মৌলিক গবেষণা উপেক্ষা করে ফলিত গবেষণায় উৎকর্ষ লাভ অসম্ভব। পাশ্চাত্য দেশে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যেখানে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত ব্যক্তি কোনো কারিগরি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক

গড়ে উঠেছে তা আমাদের দেশে প্রায় অনুপস্থিত। আমাদের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই নবীন ভারতীয় শিল্পের গবেষণা ও উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর অধীনে অনেকগুলি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সাধারণভাবে এই গবেষণাগারগুলি তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারে নি। এর কারণ হিসাবে অনেকেই স্থানীয় শিল্পমহলের বিদেশী কারিগরিবিদ্যার সম্মোহনকেই দায়ী করেন। কিন্তু এটাই প্রধান বা প্রকৃত কারণ নয়। আসলে শিল্প সর্বদাই মান ও লাভ-খরচ হিসাব সচেতন। আমাদের গবেষণাগারগুলি প্রতিযোগিতামূলক খরচে নির্দিষ্ট মানের কারিগরি দিতে না পারার জন্যই দেশীয় কারিগরি বর্জিত হয়েছে। আমাদের কাজে উৎকর্ষতার অভাবই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার সিংহভাগকে সমাজের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

সমাজের প্রতি শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা নিয়েও আলোচনা চলেছে। ইদানীংকালে জনমানসে শিক্ষকদের ভাবমূর্তি অপেক্ষাকৃতভাবে মলিন হয়ে গিয়েছে। শিক্ষকদের সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে, তারা অযোগ্য, অসৎ ও কর্তব্যে অবহেলা করেন। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, শিক্ষকদের মধ্যে সংখ্যালঘু হলেও উপেক্ষেণীয় নয় এরকম এক অংশ এই সমস্ত দোষে দুষ্ট। এর প্রকৃত কারণ কি? একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে গণতন্ত্রীকরণের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে চলে গেছে, দোষী শিক্ষকদের অধিকাংশই তাদেরই প্রশ্রয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে প্রবেশ লাভ করেছেন, পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতার পদগুলি দখল করে আছেন। শিক্ষাগত ও গবেষণায় যোগ্যতা এখন আর নিয়োগ বা পদোন্নতিতে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে না, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতাই বর্তমানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মজার কথা হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রাজনীতিবিদ্ ও আমলারাই এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মান অবনয়নের জন্য শিক্ষককুলকে দায়ী করে গণমাধ্যমে বিশেষভাবে প্রচার চালাচ্ছেন। এটা অধিকাংশ সৎ নিষ্ঠাবান ও দক্ষ শিক্ষকদের হতোদ্যম করে তুলেছে। তবে তাদের হতাশায় ম্রিয়মান হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সম্পূর্ণভাবে শিক্ষককুলের উৎকর্ষতার ওপর নির্ভর করে। কাজেই সহকর্মীদের একাংশের নিন্দনীয় ক্রিয়াকলাপের প্রতি নির্লিপ্ত থাকা অনুচিত। কারণ এতে বিপথগামীরা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকরা আরও প্রশয় পায় ও নির্লজ্জভাবে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব ও প্রভাবের অবস্থান থেকে এই সমস্ত সহকর্মীদের সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে এবং একই সঙ্গে সততা ও নিষ্ঠার সাথে পঠন-পাঠন ও গবেষণায় উৎকর্ষতালাভ করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনের এটাই একমাত্র ও সঠিক উপায়। এই কাজের জন্য প্রয়োজন শিক্ষকদের কর্ম ও কর্মপদ্ধতির ধারাবাহিক ও সুষ্ঠু মূল্যায়ন। মূল্যায়ন পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে অনেক গবেষণা ও আলোচনা হতে পারে। তবে পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে আমরা এই শিক্ষা নিতে পারি যে, এই মূল্যায়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও গবেষণার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাই করবেন। বাইরের শক্তিগোষ্ঠী দ্বারা শিক্ষকদের মূল্যায়ন বর্তমানের অবিচার ও অনাচারকেই প্রশয় দেবে এবং বাড়িয়ে তুলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকেও উন্নত এবং আধুনিক করতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। প্রশাসনকে উন্নত ও কর্মদক্ষ করার অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ভবনের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রশাসনের প্রকৃত উন্নতি খুব কমই হয়েছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগগুলির ভবনের সাথে প্রশাসনিক ভবনের, শিক্ষকদের ঘরের সঙ্গে প্রশাসনিক আধিকারিকদের ঘরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য সুযোগসুবিধাগুলি তুলনা করে দেখলে মনে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনটাই মুখ্য, পঠন-পাঠন ও গবেষণা এ সব গৌণ। আমাদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী অর্থাভাবের শিকার। অর্থাভাবের জন্য সাধারণত সর্বাগ্রে গ্রন্থাগার, গবেষণাগার ইত্যাদির ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করা হয়, প্রশাসনিক খরচ নয়। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের মতামত খুব একটা গ্রহণ করেন না। শিক্ষকরা যখন নিজস্ব প্রয়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন জায়গা থেকে গবেষণার জন্য অনুদান সংগ্রহ করেন তখন সেই অনুদানের অর্থ ঠিক সময়ে প্রয়োজন মতো প্রশাসনিক ভবন থেকে পেতে অধিকাংশ শিক্ষকের কি অসুবিধা এবং হয়রানি হয় সেটা সকলেরই জানা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও ছাত্রদের অধিকাংশর মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, প্রশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাবিভাগকে সাহায্য করা

নয়, তাদের ওপর কর্তৃত্ব করা এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের হেনস্থা করা।

এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও বাইরের সমাজের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত ? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ, প্রকৃতি এবং সমাজের ও দেশের পক্ষে এর প্রকৃত গুরুত্ব সম্বন্ধে সমাজের একটা বিরাট অংশের সম্যক সচেতনতার একান্ত অভাব অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সত্যই জ্ঞান বিকাশের প্রতিষ্ঠান করে তুলতে সক্ষম হলে সমাজের প্রকৃত উপকার হবে। জ্ঞানের বিকাশে অসাধুতা ও অনৈতিকতার কোনো স্থান নেই, অযোগ্যর কোনো ভূমিকা নেই। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাতে উৎকর্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার ধারক ও বাহক হয় সেইদিকে সমাজকে দৃষ্টি দিতে হবে। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গুণগত উৎকর্ষতা। এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, উপযুক্ত শিক্ষা, যোগ্যতা ও মানসিকতাসম্পন্ন খুব কম ব্যক্তিই আজকাল শিক্ষকতা ও গবেষণাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর কারণ বহুল। প্রথমত, বিগত দুই দশকে শিক্ষকতার থেকে অনেক আকর্ষণীয় কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকতার জন্য, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা সৎভাবে অর্জন করতে গেলে অন্যান্য চাকুরির তুলনায় স্বল্পতর বেতনে দীর্ঘতর সময় ধরে শিক্ষানবিশী করতে হয়। তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের (বা যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের) ন্যূনতম পরিকাঠামোগত প্রয়োজনও ঠিকমতো মেটানো হয় না — এতে নিয়মিত পঠন-পাঠন ও গবেষণা ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। গ্রন্থাগারে নিয়মিত বই ও পত্রপত্রিকা কেনা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্বল্পমেয়াদি শিক্ষক আদানপ্রদান, নিয়মিত গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান, গবেষণাগারগুলির যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি যে-সমস্ত কর্মাবলী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন — এ-সবের জন্য অর্থসংস্থান প্রায় করাই হয় না। এর কারণ খুব সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু ক্রিয়াকলাপের জন্য ন্যূনতম কি পরিকাঠামো দরকার সে-বিষয়ে সাধারণভাবে বৃহত্তর সমাজের অজ্ঞতা।

গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসভা ও কার্যনির্বাহী সমিতিতে যারা বৃহত্তর সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে সভ্য হয়েছেন — তাদের অবশ্য এই সমস্ত ব্যাপারে কোনোই চিন্তা নেই। কারণ হয় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষেই অজ্ঞ, নয়ত তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উন্নতিসাধন নয়। চতুর্থত, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ বাইরের একদল রাজনীতিবিদ্ ও আমলার হাতে চলে যাওয়ায় সৎ, নীতিপরায়ণ শিক্ষকদের প্রায়ই যে গ্লানি ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়, সে-জন্যও অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে চান না। শিক্ষাগত যোগ্যতায় উৎকর্ষ এবং উপযুক্ত মানসিকতাসম্পন্ন লোকেরা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে (এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে) শিক্ষকতাকে যাতে সম্মানজনক ও আকর্ষণীয় মনে করেন— বৃহত্তর সমাজকে সে দায়িত্ব নিতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে সঠিকভাবে লালন করবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ ও অন্যান্য উপকরণের সংস্থান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে-দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি (ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি) উন্নতমানের নয়, সে দেশ সামগ্রিকভাবে উন্নতিও করতে পারে না।

সমাজ অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়কে পালন করবে, কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করবে না। সমাজের কোন্ অংশের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য-স্বাধীন চিন্তাদ্বারা জ্ঞান আহরণকে—ব্যাহত করবে ও এর গুণমান ও উৎকর্ষতার অবক্ষয়ই ঘটাবে। এখানেও আমরা উন্নত দেশগুলির থেকে শিক্ষা নিতে পারি। এই দেশগুলিতে সরকারি বা বেসরকারি যে সূত্র থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থের সংস্থান হোক না কেন —বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করে না। পরিচালনা ও গুণমান বজায় রাখার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত নিজস্ব। কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কর্মসূচীতে উৎকর্ষতা ও সততার সামান্যতম অভাব পরিলক্ষিত হলেই সমাজ সেই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে। এটাই সঠিক পন্থা। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, তাদের প্রতিভূ হিসাবে যে রাজনীতিবিদ ও আমলারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিগত করেছেন, তাদের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মুক্ত করে আর্থিক সচ্ছলতার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। তবেই বৃহত্তর সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করবে, অন্যথায় নয়। ❑

ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স—একটি স্বপ্নের অপমৃত্যু?

পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার নিয়ে সাধারণ আলোচনার পাশাপাশি আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দূষণের অনুসন্ধান ও সমীক্ষামূলক প্রতিবেদনও রাখতে চাই। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় CASE STUDY REPORTS। এই উদ্দেশ্যে ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স নিয়ে আমাদের প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করা হলো। এই প্রতিবেদনের তথ্য/বক্তব্য সম্পর্কে যে কোনো লিখিত প্রতিক্রিয়া পেলে আমরা তা প্রকাশের চেষ্টা করব। — সম্পাদকমণ্ডলী

প্রস্তাবনা

বছর সাতেক হলো ডানকুনিতে কোল ইণ্ডিয়ার অধীনে চলছে ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স (DCC)। সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী কারিগরি ভিত্তিতে প্রকল্পিত ভারতের একমাত্র কয়লাভিত্তিক রাসায়নিক কারখানা ডি সি সি। পুরোমাত্রায় উৎপাদনশীল, লাভজনক ও সুস্থিত হবার জন্য এ-রকম একটি কারখানায় সাত বছর যথেষ্ট দীর্ঘ সময় বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু তা আদৌ হয় নি। উল্টে এই কারখানাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠেছে। ডি সি সি-র উৎপাদন পরিকল্পিত মান ও পরিমাণের ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারে নি। এমনকি পরিকল্পনামাফিক সমস্ত সামগ্রীও উৎপাদিত হয় না। অন্যদিকে কারখানার চারপাশের এলাকায় ব্যাপক ও মারাত্মক দূষণ ঘটেছে বলে অভিযোগ।

গত 7 আগাস্ট' 1996 কয়লাদপ্তরের সেক্রেটারি ডানকুনি কারখানা পরিদর্শন করেন এবং তারপর কারখানা কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের বিভিন্ন ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল — কী করে ডি সি সি-র অর্থনৈতিক সাফল্য আসে। খবরে প্রকাশ (*দ স্টেট্‌সম্যান*, 9. 8. 96), কারখানাটির পুরোপুরি বা আংশিক বেসরকারিকরণের প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হয়।

ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স নিয়ে আমরা বিগত প্রায় বছরখানেক ধরে খোঁজখবর নিয়েছি। কারখানার ভেতরের ও বাইরের কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। মূল প্রোজেক্ট রিপোর্ট এবং সাম্প্রতিক কিছু অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনার রিপোর্টও আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। এসবের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে এই প্রাথমিক প্রতিবেদন।

উদ্যোগের পশ্চাৎপট

আমাদের দেশে পেট্রোলিয়াম পর্যাপ্ত না পাওয়া গেলেও কয়লার ভাণ্ডার নিতান্ত অপ্রতুল নয়। কিন্তু এই কয়লাভাণ্ডারের এক বিরাট অংশই নিচুমানের কয়লা যা ধাতুশিল্পের উপযোগী কোক তৈরির অনুপযুক্ত। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত নিচুমানের কয়লাই শক্তি-উৎস হিসেবে পেট্রোলিয়ামের ঘাটতি পূরণে অনেকটা সাহায্য করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইওরোপে — বিশেষত ইংল্যাণ্ড ও জার্মানিতে — পেট্রোলিয়ামের বিকল্প এক শক্তি-উৎস হিসেবে কয়লা নিয়ে প্রচুর মাতামাতি হয়েছে। কাজও হয়েছে অনেকটা, অপেক্ষাকৃত নিচুমানের কয়লাকে বাতাসের অবর্তমানে তাপ প্রয়োগে ভেঙে ফেললে উদ্বায়ী অংশ বাষ্প/গ্যাস হিসেবে বেরিয়ে আসে, পাত্রে পড়ে থাকে অবশেষ — কোক। এ-ধরণের প্রক্রিয়া সাধারণভাবে 'কার্বোনাইজেশন' প্রক্রিয়া নামে পরিচিত। এটি আবার প্রধানত দু-ধরণের — নিচু ও উঁচু তাপমাত্রার কার্বোনাইজেশন। ....উদ্বায়ী অংশের মধ্য থেকে পৃথকভাবে পাওয়া সম্ভব — অ্যামোনিয়া, আলকাতরা এবং জ্বালানি গ্যাস (কোল গ্যাস)। আলকাতরা থেকেও পাতন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে লাইট অয়েল, মিড্‌ল অয়েল, হেভি অয়েল, ফেনল, বেন্‌জিন ইত্যাদি। এছাড়াও, নিচু মানের কয়লা থেকে সরাসরি বা ঘুরপথে মোটরগাড়িতে ব্যবহার্য তরল জ্বালানি তৈরির পন্থাও আবিষ্কৃত হয়েছিল জার্মানিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানি কয়লা থেকে তরল জ্বালানি উৎপাদনও করত। কিন্তু পরে এই উদ্যোগে ভাঁটা পড়ে। বর্তমানে, দক্ষিণ আফ্রিকাই একমাত্র দেশ যেখানে কয়লা থেকে গ্যাসোলিন তৈরির তিনটি বড় বড় কারখানা চালু আছে।

ভারতের নিচুমানের কয়লার সদ্ব্যবহারের কোনো পরিকল্পিত উদ্যোগ বরাবর উপেক্ষিতই ছিল। প্রায়ই কয়লার স্তূপে আগুন ধরিয়ে খানিকটা জ্বালিয়ে তারপর জল ঢেলে বাড়িতে ব্যবহারের

জন্য আধা-কোক তৈরি করা হতো (এখনও কিছু কিছু করা হয়)। এটা একটা বিরাট অপচয়। গ্যাস, আলকাতরা ইত্যাদি নষ্ট তো হয়ই পরিবেশও দূষিত হয়। স্বাধীনতার পরে পরেই ধানবাদের সেন্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (CFRI) একদল বিজ্ঞানী দেশের এই অপচয়-রোধে ব্রতী হয়ে অপেক্ষাকৃত নিচুমানের কয়লার কার্বোনাইজেশনের কারিগরি খুঁটিনাটি নির্ধারণের প্রয়াস পান। কারখানায় উৎপাদনের লক্ষ্যে সি এফ আর আই-তেই ছোটো প্ল্যান্টও (Pilot Plant) তৈরি করেন এবং তদানীন্তন ডিরেক্টর ড. লাহিড়ীর সঙ্গে বিজ্ঞানীদল পদ্ধতিটির পেটেন্টও নেন। (কয়লাকে তরল জ্বালানিতে রূপান্তরিত করার কাজও কিছু হয়েছিল, সি এফ আর আই এবং খড়গপুর আই আই টি-তে)। তখনই সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা ভাবেন যে, পূর্বভারতে একটি কর্বোনাইজেশন প্ল্যান্ট স্থাপন খুবই যুক্তযুক্ত হবে। রানিগঞ্জের প্রচুর পরিমাণ এমন কয়লার মজুত আছে যা কার্বোনাইজেশন পদ্ধতিতে রাসায়নিক শিল্পের পক্ষে প্রায় আদর্শ। দেশীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং রাসায়ন শিল্পে দেশের স্বনির্ভরতার স্বপ্নে বিজ্ঞানীদল কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কাছে কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন এবং এমনকি কেউ কেউ সি এফ আর আই ছেড়ে কোল ইন্ডিয়ায় চাকরিও নিলেন। .... নানা জল্পনা-কল্পনার শেষে ঠিক হলো পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেবার আগে কোনো কার্বোনাইজেশন টেকনোলজির অবস্থাটা ইওরোপে একবার প্রত্যক্ষ করে আসা দরকার। কোল ইন্ডিয়ার তরফে একটি বিশেষজ্ঞ দল ইংলন্ড, জার্মানি ও ডেনর্মাক পরিদর্শন করলেন। সেখানকার কারখানা ও কারিগরির অবস্থা দেখেশুনে তাঁদের উপলব্ধি হলো যে, নিজেদের কারিগরির ভিত্তিতে কারখানা করতে নামাটা বেশি ঝুঁকির হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে বরং বি ডব্লিউ ডি (ইংল্যান্ড)-এর সুপ্রতিষ্ঠিত কারিগরি আমদানিই শ্রেয়। ইওরোপে একসময় বি ডব্লিউ ডি কারিগরির ভিত্তিতে প্রায় সাতশো কারখানা চলত। সত্তরের দশকেও তার অনেকগুলি বেশ মসৃণভাবেই চলছিল।

গোড়াপত্তন

অবশেষে 1977 সালে বি ডব্লিউ ডি-র কারিগরি আমদানির ভিত্তিতেই প্রায় 50 কোটি টাকার প্ল্যান্ট বসানোর নির্দিষ্ট পরিকল্পনা পেশ করা হলো। স্থান নির্বাচন হলো ডানকুনি। ভারতে তখন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের হাওয়া। প্রস্তাব আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পেতেই কেটে গেল আরও দুটো বছর। ইতিমধ্যে এসে গেল আবার একটি রাজনৈতিক পালাবদল। 1984-তে কারখানা চালু হবার কথা ছিল, কিন্তু প্রাথমিক কাজকর্মই শুরু হলো 1984-তে। হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের (HEC) ওপর ন্যস্ত হয়েছিল আমদানি করা যন্ত্রপাতি ও প্ল্যান্টের কার্যকারিতা বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব। কিন্তু এইচ ই সি-র গড়িমসি ও অপদার্থতায় শুরুর পরেও, কাজে এল না প্রয়োজনীয় গতি। সময় গড়িয়ে চলল। বেড়ে চলল খরচ। পুরোনো অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার কর্মীরাও অবসর নিয়ে ফেললেন অনেকে। কারখানা চালু হলো না। বি ডব্লিউ ডি-র সঙ্গে চুক্তির মেয়াদও পেরিয়ে গেল। যন্ত্রপাতি আমদানি হয়েও পড়ে রইল। অবশেষে নানা মহলের চাপে ও সমালোচনায় তড়িঘড়ি কারখানা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হলো। বিশেষ ব্যবস্থায় বি ডব্লিউ ডি-র দুজন কারিগরি বিশেষজ্ঞকে ডেকে এনে কোক ওভেনের পাঁচটি বেঞ্চের (প্রতিটি বেঞ্চে কুড়িটি করে মোট একশ-টি কয়লাধার বা রেটর্ট) প্রথমটিতে কয়লা ভর্তি করে উৎপাদন শুরু হলো, সেটা 1989 সাল! নিয়ম মেনে কারখানার কমিশনিং কিন্তু হলো না। চুক্তিমাফিক প্ল্যান্টের কার্যকারিতা বুঝে নেওয়া হলো না। বি ডব্লিউ ডি-র লোক ফিরে গেল।

বর্তমান অবস্থা

শুরু থেকেই কতকগুলি কারিগরি ত্রুটি ডি সি সি-কে খোঁড়া করে রেখেছে। রেটর্ট তথা কয়লাধারগুলির মাঝের ফাঁকে গ্যাসের আগুনে 1350°C তাপমাত্রা তোলার জরুরি প্রয়োজন। শুরুতে তা তোলার চেষ্টা হয় নি। পরেও করা যায়নি। ফলে কয়লা থেকে বেরোনো আলকাতরার তাপ-বিয়োজন (Cracking) ভালো হয় না। গ্যাস কম হয়, মানও হয় খারাপ। আধগলা কয়লা জমে রেটর্টগুলিকে ক্রমশ বুঁজিয়ে ফেলতে থাকে, তাদের কয়লাধারণ ক্ষমতা কমে যায়। উৎপাদনও কমে যায়। রেটর্টকে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করতে গিয়ে ক্ষতিও করা হয়েছে। বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় বেঞ্চ বন্ধ করে দিয়ে অন্য তিনটি বেঞ্চ চালু করা হয়েছে। সম্ভবত ঐ দুটি বেঞ্চ এতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, সেগুলি কাজের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। .... মূল এইসব কারিগরি ত্রুটির জন্যই ডি সি সি-র উৎপন্ন কোল গ্যাস নিম্নমানের (তাপদায়ী ক্ষমতা কম), উৎপাদন অনিয়মিত, কাজেই গ্রাহকরাও নির্ভর করতে পারেন

না। এখানকার আলকাতরাও খারাপ, তার থেকেও যথোপযুক্ত মানে ও প্রত্যাশিত পরিমাণে উপজাত রাসায়নিক পদার্থগুলিও পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এইসব রাসায়নিক পদার্থ চড়া দামে আমদানিই করতে হয় দেশকে! এইসব উপজাত পদার্থ উৎপাদন শোধন ইত্যাদির জন্য যেসব ব্যবস্থা ছিল তাও দীর্ঘদিন অকেজো পড়ে থাকায়, ঠিকমতো কাজ করে না, পুরোপুরি চালানোর রসদও অবশ্য থাকে না।

সংক্ষেপে এই হলো ডিসিসি-র অবস্থা। কারখানা কর্তৃপক্ষ মৌলিক কারিগরি ত্রুটির কথা এড়িয়ে যান। তাঁরা একটার পর একটা পরিকল্পনা পেশ করে যাচ্ছেন — কিভাবে সামান্য কিছু ব্যবস্থা নিলেই, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো যাবে, পণ্য বাজারজাত হবে এবং কোম্পানি লাভজনক হয়ে উঠবে!

অন্যদিকে ডিসিসি ইতিমধ্যেই আশপাশের গ্রামের মানুষজনের কাছে আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। এমনকি, একটা স্কুল থেকেও অভিযোগ করা হয়েছে ছাত্ররা অসুস্থ হয়ে পড়ছে বলে। ডানকুনি ক্যানেল যা গঙ্গা থেকে বেরিয়ে আবার গঙ্গাতেই মিশেছে—হয়ে পড়েছে ভীষণভাবে দূষিত। মাছ হয় না, যাও বা হয় তা খাওয়ার অযোগ্য (স্থানীয় গরীর মানুষ অবশ্য তাই খান)। চাষের জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ফলন কমছে। কিছু জমিতে এমন ধান হয় যা মোটেই স্বাভাবিক নয়, ঐ ধান থেকে কালো খসখসে চাল হয়, ভাত হয় ফাটা ফাটা, কালো, দুর্গন্ধযুক্ত। পরীক্ষা করিয়ে দেখা গেছে ফেনল জাতীয় পদার্থ খুব বেশিমাত্রায় রয়েছে ঐ ধানে ও চালে। এমনকি খড় যা হয় তা গরুও খেতে চায় না। লোকজন ভুগছে নানান রোগে। ক্যানেল ও সংলগ্ন মাঠে যাঁরা নিয়মিত নামেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ ধরণের দুরারোগ্য চর্মরোগের বেশ প্রাদুর্ভাব। গৃহপালিত গরুছাগলের মধ্যেও অকালমৃত্যু ঘটছে অনেক বেশি। গ্রামবাসীদের ধারণা তারাও দূষণেরই শিকার।

কারখানা কর্তৃপক্ষ স্বীকারই করতে চান না যে,-ডিসিসি দূষণ ছড়াচ্ছে। স্থানীয় মানুষজনের কাছে তাঁরা বরাবর বলে আসছেন ডিসিসি থেকে যে জল বা গ্যাস ছাড়া হয় তাতে ক্ষতিকর কোনো পদার্থই নির্ধারিত মাত্রার বেশি থাকে না। তবুও দূষণ নিয়ে তাঁরা খুব সতর্ক বলেই কলকাতার অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ এবং নাগপুরের ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (NEERI) — এদের মতো পরিবেশ বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দূষণ সংক্রান্ত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। তাঁদের পরামর্শমতোই দূষণ-রোধক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। গ্যাস যে বাতাসে মাঝে মাঝে ছেড়ে দেওয়া হয় তা তাঁরা দেখে বুঝতে পারেন। ডানকুনি ক্যানেল যে দূষিত ও মৃত তাও স্পষ্ট। স্থানীয় অনেক মানুষের তাই দৃঢ় ধারণা — ডিসিসি-তে বর্জ্য শোধন কিছুই হয় না। ওঁরা শুধু বর্জ্যগুলিকে আটকে রাখেন — সময় ও সুযোগ মতো (যেমন বর্ষাকালে) প্রচুর জলের সঙ্গে মিশিয়ে ছেড়ে দেবেন বলে। এর ফলে হয়তো ক্ষতিকর পদার্থের ঘনত্বের উর্ধ্বসীমা লঙ্ঘন না করার 'নিয়মরক্ষা' হয় কিন্তু মোট দূষিত পদার্থের পরিমাণ আদৌ কমে না। স্থানীয় মানুষরা আতঙ্কিত — ডিসিসি-র ক্ষতিকর পদার্থে মাটির নিচের জলতলও দূষিত না হয়ে পড়ে।

সমস্যা, সম্ভাব্য সমাধান

প্রশ্ন উঠেছে—ডিসিসি-কে কি বাঁচানো সম্ভব? ডিসিসি কর্তৃপক্ষ তথা কোল ইন্ডিয়ার কাছে এ-প্রশ্নের সরলার্থ হয়তো দাঁড়ায় — ডিসিসি-কে কি করে লাভজনক করে তোলা যায়। কিন্তু আমদের মনে হয় ডিসিসি-র বাঁচার প্রশ্নটিকে কর্মীদের নিরাপত্তা এবং পরিবেশের সুরক্ষার প্রশ্ন থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। ডিসিসি পুরোমাত্রায় উৎপাদনশীল ও লাভজনক হয়ে উঠুক। কর্মীদের রুটি-রুজির সংস্থান বজায় থাকুক—এটা নিশ্চয়ই কাম্য। কিন্তু সেইসঙ্গে দেখা দরকার নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় বা বিষে কর্মীদের পঙ্গুত্ব বা অকালমৃত্যু যেন না ঘটে। আবার বাইরের হাজার হাজার মানুষের কাছেও ডিসিসি যেন না হয়ে ওঠে বিভীষিকা! বন্ধ্যা হবে না জল-মাটি, বাতাস হবে না বিষাক্ত এবং সর্বোপরি তাঁরা ডিসিসি-কে তাঁদের এলাকার এবং দেশের গর্বের একটি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ফসল হিসেবে দেখবেন — এ কি আদৌ সম্ভব? হলে কিভাবে হবে, নাহলে, কেন নয়? আমাদের পর্যালোচনা থেকে এসব প্রশ্নের দু-ধরণের উত্তর সম্ভব বলে মনে হয়েছে।

এক: ডিসিসি-কে পুরোপুরি উৎপাদনশীল ও লাভজনক করে তোলা অসম্ভব। পরিবেশ দূষণও ঠেকানো অসম্ভব। কারণ স্থিতিশীল ও পরিকল্পিত পথে কারখানা না চললে তার দূষণও ঘটে এলোমেলো পথে ও প্রক্রিয়ায়, তাকে বাগে আনা কঠিন। আসলে এটি একটি পুরানো ভুলের জের। 1989-তে যখন

ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স (DCC)
উৎপাদন ও পরিবেশ— কিছু তথ্য

কলকাতা থেকে দূরত্ব	20 কি. মি.
মূল কারখানা এলাকা	20 একর
স্থায়ী কর্মীসংখ্যা	600 এর বেশি

(এছাড়া আছে ঠিকাদার নিযুক্ত অস্থায়ী কর্মী, প্রায় 250)

উৎপাদন লক্ষ্য বনাম প্রকৃত

	লক্ষ্য (দিনপ্রতি)	প্রকৃত (দিনপ্রতি)
কার্বোনাইজেশনে ব্যবহার্য কয়লা	1500 টন	500-600 টন
কোক	850 টন	300-350 টন
গ্যাস	150 লক্ষ ঘনফুট	40-50 লক্ষ ঘনফুট
লাইট অয়েল	10 টন	1-2 টন
হেভি অয়েল	20 টন	2-5 টন
পিচ	32 টন	7-10 টন
ফেনল, ক্রেসল, জাইলিনল	4 টন	0-1 টন
অ্যামোনিয়াম সালফেট	15 টন	0-3 টন
গন্ধক (অশুদ্ধ)	1.5 টন	0.5-1 টন

1995 ও 96 সালের মাসিক হিসাব অনুযায়ী, গড় দৈনিক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ উৎপাদন।

পরিবেশ

ডানকুনি ক্যানেল (দৈর্ঘ্য)	— 26 কিমি
জলাভূমি	— প্রায় 1000 একর
ক্ষতিগ্রস্ত চাষভূমি	— প্রায় 30 বর্গকিমি
বেশি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম	— 14 টি
ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা	— 1লক্ষ
ক্ষতিগ্রস্ত মোট এলাকা	— 125 বর্গকিমি/400 গ্রাম

প্রায় জোর করেই তাড়াহুড়োয় কারখানায় কাজ শুরু করে দেওয়া হলো তখনই ভুলটা ঘটে গেছে। তখন বিশ্বজুড়েই পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ইওরোপেও আর কয়লাকে পেট্রোলিয়ামের বিকল্প শক্তি-উৎস হিসেবে ভাবা হচ্ছে না। কয়লাভিত্তিক শিল্প যা রমরমিয়ে চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, সেগুলিরও অধিকাংশই 1989-90-তে বসে গেছে (অবশ্যই 50-60 বছর পূর্ণদক্ষতায় চলার পর)। পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, রিফাইনিং, মার্কেটিং ইত্যাদিতে আমূল ও ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের বাজার তথা পেট্রোলিয়াম পণ্যে ছেয়ে গেছে। ভারতের বাজারেও পেট্রোলিয়াম পণ্য বিস্তৃত হয়েছে। রান্নার গ্যাস—এল পি জি জাঁকিয়ে বসেছে। ধোঁয়াহীন কোক এবং ভালো জ্বালানি গ্যাস সরবরাহ করে কলকাতা ও তার চারপাশকে দূষণমুক্ত রাখা ছিল ডিসিসি-র অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডিসিসি-র গ্যাসের আর তেমন চাহিদাই ছিল না। তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল ডিসিসি গুটিয়ে নেওয়ার। কিছু ক্ষতি হতো ঠিকই। কিন্তু তার পরিমাণও আর বাড়ত না। পরিবেশও নষ্ট হতো না। .... বিভিন্ন ইঙ্গিত উপেক্ষা করে জোর করে ডিসিসি-কে এখনও চালিয়ে গেলে ক্ষতির পরিমাণই শুধু বাড়বে — আখেরে লাভ হবে না কিছুই।

দুই : এই অবস্থানের বিপরীত দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, ভারতের শক্তি সংকট এখনও অব্যাহত। পেট্রোলিয়াম এখানকার শক্তি চাহিদার একটা অংশমাত্র পূরণ করে। শক্তির নিরন্তর চাহিদার পরিস্থিতিতে শক্তি বিক্রি করা যায় না এটা হতে পারে না। শহরের জঞ্জাল থেকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নতুন করে নেওয়া হচ্ছে যখন, তখন ডিসিসি-র সম্ভাবনা কেন শেষ হয়ে যাবে? ডিসিসি-র প্রধান সমস্ত প্রোডাক্টই শক্তি-উৎস। গ্যাস, কোক, আলকাতরা ; আলকাতরা থেকে পাওয়া লাইট অয়েল, মিডল অয়েল ইত্যাদি সবেরই জ্বালানি হিসেবে বাজার পাওয়া খুবই সম্ভব। এমনকি আলকাতরা থেকে যে বেন্‌জিন, টলুইন, জাইলিন ইত্যাদি পাবার কথা, যে ফেনল, ক্রেসল, গন্ধক এখানে উৎপাদিত হওয়ার কথা, এসবই অত্যন্ত চড়া দামে আমদানি করতে হয় আমাদের। মূল সমস্যাটা তাই টেকনিক্যাল, মার্কেটিং এবং ম্যানেজমেন্টের। দূষণের সমস্যাটা গৌণ এবং অবশ্যই নিয়ন্ত্রণযোগ্য। যদি প্রোডিউসার গ্যাস-প্ল্যান্ট ঠিকমতো চলে, যদি রেটর্টের ফ্লুতে তাপমাত্রা বাড়নো যায়, যদি আলকাতরা ডিস্টিলেশন-প্ল্যান্ট, অ্যামোনিয়াম সালফেট-প্ল্যান্ট, সালফার রিকভারি-প্ল্যান্ট সব চালু হয় ও ঠিকমতো চলে, তবে গ্যাসীয় জ্বালানির এবং কোক ও অন্যান্য উপজাত পদার্থের মানও হবে উন্নত। উৎপাদন অব্যাহত থাকলে গ্রাহকদের কাছেও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে যা সবচেয়ে জরুরি। নির্ধারিত পণ্য পরিমাণ মতো উৎপাদিত হলে বাতাসে ও জলে দূষণ আপনা থেকেই কমে যাবে এবং এফ্লুয়ান্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে

(ETP) সহজেই দূষণমুক্ত করা যাবে। .... তবে এই সব দিকে বাস্তবায়িত করতে টাকা প্রয়োজন। কোল ইন্ডিয়া নতুন করে ডিসিসি-র পেছনে টাকা ঢালতে অনিচ্ছুক বলেই মনে হয়। তাই কারখানাকে বেসরকারি মালিকানায় দিয়ে দেওয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে। কারও মতে বেসরকারি মালিকানাধীন ডিসিসি দুহাতে টাকা কামানোর জায়গা হবে।

উপসংহারের ভূমিকা

ডিসিসি-র ঘোলাজলে মাছ ধরার লোকের অভাব নেই। কারও লাভ বর্তমান অবস্থা বজায় থাকলে, কারও লাভ কারখানাটি বেসরকারি মালিকানাধীনে গেলে। কারও বা দুক্ষেত্রেই লাভ। কিন্তু দেশের ও দেশের মানুষের লাভ কিসে সেই সিদ্ধান্তটির অপেক্ষায় আছে ডিসিসি। আর এক্ষেত্রে ডিসিসি বলতে যন্ত্রপাতি ও কর্মীবাহিনীসহ শুধু কারখানাটিকেই বোঝায় না, গ্রামগঞ্জসহ জনঅধ্যুষিত এক বিস্তীর্ণ এলাকাও ডিসিসি-র অন্তর্গত। এই বৃহত্তর পূর্ণতর ডিসিসি-র একটা সত্যিকারের লাভক্ষতির হিসেব হওয়া খুবই প্রয়োজন স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি। যার মধ্যে শুধু কয়লা, কোক, আলকাতরা, গ্যাস ইত্যাদির হিসেবই থাকবে না, থাকবে ঐ জনবসতির জমির, ফসলের, জীবিকার, স্বাস্থ্যের, শ্রমদিবসের লাভক্ষতিরও হিসেব।

গোঁজামিল দিয়ে এখানে একটু ওখানে একটু রদবদল ইত্যাদির পেছনে ইতিমধ্যে টাকা কিছু কম খরচ হয় নি। দরকার একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা। উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটিই পারে এ-কাজ করতে। বি ডব্লিউ ডি থেকেও যেমন কারিগরি বিশেষজ্ঞদের আনা যেতে পারত, দেশের মধ্যেও তেমন অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞের অভাব নেই। কমিটির মধ্যে নিরাপত্তা ও দূষণ বিশেষজ্ঞদেরও থাকা দরকার। দরকার ম্যানেজমেন্ট এবং মার্কেটিং বিশেষজ্ঞেরও।

সংশোধিত ফ্যাক্টারিজ অ্যাক্ট ও এনভায়রনমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী ডিসিসি একটি বিপজ্জনক শিল্প (Hazardous Industry)। যতদিন ডিসিসি চালু থাকবে, ততদিন ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্টের 41বি ধারা এবং এনভায়রনমেন্ট অ্যাক্টের অধীনে হ্যাজার্ডাস কেমিক্যাল রুলস এর 15 ও 17 নং রুল অনুযায়ী ডিসিসি-কে কর্মীদের কাছে যথাযথভাবে নিরাপদ হতে হবে এবং পরিবেশের সম্ভাব্য দূষণ ও তার প্রতিরোধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আগাম সচেতন করতে হবে — এ দাবিও নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয়।❑

একটি আবেদন

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা গবেষণামূলক সমীক্ষা করতে নেমে আমরা উপলব্ধি করছি যে শুধু, পরিসংখ্যান দিয়ে প্রকৃত চিত্রটাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। রোগী হিসেবে মানুষের অভিজ্ঞতাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমরা এটাও বুঝতে পারছি যে সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার বৃত্তের বাইরের ক্ষেত্রটাও নিতান্ত ছোটো নয়।

আমাদের আবেদন ঃ রোগী হিসেবে নিজের বা আত্মীয়বন্ধুদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠান। সরকারি বেসরকারি, প্রচলিত অপ্রচলিত যে কোনোভাবেই রোগ প্রতিরোধ বা প্রতিকারের প্রয়াসের ও ফলাফলের লিখিত বিবরণে আমরা আগ্রহী। তথ্যভিত্তিক হলে ভালো হয়। সম্ভব হলে প্রাসঙ্গিক দলিল, কাগজপত্রের (রিপোর্ট, প্রেসক্রিপশন ইত্যাদি) প্রতিলিপি সহ।

বিগত কুড়ি বছরের অধিককাল ধরে বিজ্ঞান ও সমাজ সম্পর্কিত নানা বিষয়ে *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* তে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। ইতিপূর্বে 'স্কুলে বিজ্ঞানশিক্ষা' নিয়ে আমরা কিছুটা ব্যাপকতর সমীক্ষা করেছি এবং পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছে। কিছুকিছু পুস্তকাকারেও প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যচিত্র নিয়েও আমরা অনুরূপ সমীক্ষা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। অনধিক দু-হাজার শব্দের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় রচনা পাঠান।

সম্পাদক, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*

C/O সুভাষ গাঙ্গুলী; B22-8, করুণাময়ী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা - 700 091

দ্বিতীয় পর্ব

বিষয় : পরিবেশ

পাঁচ

দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার উর্ধ্বে পরিবেশ কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়। মানুষের সৃষ্টি-স্থিতি-কৃতি সবই পরিবেশনির্ভর। লয়ও বোধহয় পরিবেশ ধ্বংস। সমাজ-সংস্কৃতি-জীবিকা সবকিছুই আজ পরিবেশ দূষনের প্রচ্ছায়া-উপস্থায়া কবলিত। বিজ্ঞান-কারিগরি পরিবেশ দূষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। দূষণ-রোধের বিজ্ঞান-কারিগরিকেই হাতিয়ার হয়ে উঠতে হবে ঠিকই কিন্তু পরিবেশমুখী একটি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তা সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়। এমনই এক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধানের উদ্যোগ — বিষয় : পরিবেশ। যে কেউ এ বিভাগে প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। কমবেশি দু-হাজার শব্দের মধ্যে লেখা পাঠান। চিঠিপত্রে মতামত জানান। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর খবরাখবর। টীকা সমীক্ষাতে প্রকাশের জন্যও বিবেচিত হবে। —সম্পাদকমণ্ডলী

বর্জ্য শোধন

(Effluent Treatment)

মোশায় পলুশান পলুশান কোরে এমোন চিল্লান
যেনো হামি চোর ডাকু আছে !
হামি একজন শরীফ আদমি
সোমাজের সেবা কোরছে।

ভগওয়ানের কিরপা, হামি ভিখ্ মাঙ্গি না
দু-পাঁচটা চাকরি ভি দিয়েছে,
সোরকারি সোব কানুন মেনেছে
ট্যাক্সো ভি দিয়েছে।

আপনি যদি কাম কাজ কোরেন
একটু-আধটু ওসুবিধা তো হোবেই,
নিকামের কোনো ঝুট-ঝামেলা নেই।

পলুশান যদি একটু-আধটু হয়
সলুশান কি বোলেন!

ভগওয়ান যা চান
হামাকে দিয়ে তাই কোরিয়ে নেন
—এই কোথাটা মানেন তো?

কোথায় কিভাবে কতখানি দূষণ ঘটছে তা জানা ও পরিমাপ করার মূল উদ্দেশ্য হলো দূষণ নিয়ন্ত্রণ। লক্ষণীয় যে, 'নিবারণ' কথাটি ব্যবহার না করে বলছি 'নিয়ন্ত্রণ', কারণ বর্জ্যপদার্থকে শোধিত করে পূর্বনির্দিষ্ট মাত্রায় কমিয়ে এনে সেগুলি বাতাসে জল বা মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া বা পুনর্ব্যবহার করাই সাধারণ রীতি। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় দূষক পদার্থ প্রকৃতিতে ছাড়ার জন্য কলকারখানার একটা ছাড় আছে। সেই ছাড়ের মাত্রা নির্ধারণ করেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং ভারতীয় মানক সংস্থা। ভারতে বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য সর্বোচ্চ গ্রহণীয় দূষণমাত্রা কিছু কিছু নির্দিষ্ট হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই আবার করা হয় নি। সে-সব ক্ষেত্রে সাধারণ কিছু মাত্রা মেনে চলতে হয়। এইসব মাত্রা নির্ধারণ করাটা বিশেষজ্ঞদের কাজ। সে-সব নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ যে নেই তা নয়, কিন্তু সে এক স্বতন্ত্র প্রশ্ন। সাধারণভাবে বলা যায় — বর্জ্যকে শোধন করে অন্ততপক্ষে নির্ধারিত মাত্রার মধ্যে যদি দূষণ সীমাবদ্ধ রাখা যায়, তাহলেই আমরা অনেকটা স্বস্তি পেতে পারি।

আরও একটা কথা। দূষণ নিয়ন্ত্রণ একটি সামগ্রিক ব্যাপার। কলকারখানা বা যে কোনো উদ্যোগের স্থান নির্বাচন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা ক্রিয়াকলাপ, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে ও অংশে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হয়। বর্জ্য শোধন তার একটি অংশ মাত্র। অবশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বলা বাহুল্য, বর্জ্য শোধন পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবেই কারিগরি নির্ভর। সাধারণ মানুষের এ-ব্যাপারে করণীয় তেমন কিছু নেই। কিন্তু দূষণ নিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক ব্যাপারটা মাথায় রেখে এখানে আমরা বর্জ্য শোধনের প্রধান প্রধান কয়েকটি

প্রক্রিয়ার মূলনীতি তথা বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করব মাত্র— টেকনিক্যাল তথা কারিগরি ব্যাপারগুলিকে অনেকটাই পাশ কাটিয়ে— গ্যাসীয়, জলীয় (তরল) এবং কঠিন বর্জ্যের জন্য পৃথকভাবে।

ক

গ্যাসীয় বর্জ্য : বিশেষ বিশেষ কলকারখানা বা উদ্যোগ থেকে গ্যাসীয় তথা বায়ুদূষণ বিশেষভাবেই ঘটতে পারে। বিচিত্র তাদের উৎস এবং প্রকৃতি (*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*, অক্টো-ডিসে '95 দ্র.)। এবং বায়ুদূষকের চিহ্নিতকরণ, মাত্রা নিরূপণ ও শোধন অনেকখানিই কী প্রক্রিয়ায় কাজ চলছে তার ওপর নির্ভরশীল। তাই সবরকম গ্যাসীয় দূষক নিয়ে এখানে আলোচনার চেষ্টা না করে বরং খুবই ব্যাপক এবং সাধারণ কয়েকটি বিষয়ে এখানে আলোচনা সীমিত করা হচ্ছে। যেমন, জ্বালানি ব্যবহার করে এমন সব ধরণের কলকারখানা বা উদ্যোগ থেকেই কমবেশি ধুলো-ধোঁয়া এবং সালফার ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়।

ধুলো-ধোঁয়া (কঠিন কণা পদার্থ বা Particulate Matter) : অপেক্ষাকৃত বড় আকারের কঠিন কণা পদার্থকে অনেক সময়ই জল দিয়ে ভিজিয়ে বা বিশেষ ছাঁকনি ব্যাগে আটকে ফেলা যায়। ক্ষুদ্রতর কণা পদার্থের ব্যাপক নির্গমণ রোধ করতে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর (ESP)-এর সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই 'অধঃক্ষেপক' যন্ত্রে কঠিন কণাপদার্থকে উচ্চমাত্রার বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের (30-100 কিলোভোল্ট) মধ্যে তড়িৎ-আহিত করা হয়। আধানবাহী কণাগুলি বিপরীত আধানে আহিত প্লেট বা টিউবের গায়ে এসে নিস্তড়িৎ হয়ে জমা হয়। মাঝে মাঝে যন্ত্রে জমা কণা পদার্থকে ঝেড়ে সরিয়ে নিতে হয়।

হাসপাতাল বড় অফিস ইত্যাদিতে অনেক সময় আরেক ধরণের ইএসপির ব্যবহার হয়। এগুলি কাজ করে অনেক কম ভোল্টেজে (6-12 কিলোভোল্ট) এবং প্রধানত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরল পদার্থের কণা অপসারণ করে।

সক্স (SO_X) তথা সালফার ডাই-অক্সাইড: সালফার-ঘটিত গ্যাসীয় দূষণের মূল উপাদান সাধারণত সালফার ডাই-অক্সাইড। অ্যাসিড-ধর্মী জল একে অনেকরকমের ক্ষারীয় বিক্রিয়কের সাহায্যে প্রশমিত করে নির্গমন রোধ করা যায়। খরচ কম রাখার জন্য এসব ক্ষেত্রে চুনাপাথর চুনজল, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় প্রশমন ইত্যাদি ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

মোটরগাড়ি থেকে নির্গত গ্যাসীয় দূষক: শহরাঞ্চলের বায়ুদূষণে মোটর গাড়ির অবদান সর্বাধিক বলে এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহনের ফলে নির্গম-নলের গ্যাসীয় প্রবাহে থাকতে পারে গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন যৌগ, কার্বন কণা, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_X) ইত্যাদি। এর মধ্যে আবার কার্বন মনোক্সাইড তীব্র বিষাক্ত। হাইড্রোকার্বন এবং NO_X শহুরে ধোঁয়াশা সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়ক। তাই এগুলির মাত্রাতিরিক্ত নির্গমন ঠেকানো খুবই জরুরি।

নানাদিক থেকে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে। মোটরগাড়ির ইঞ্জিনের ডিজাইন, জ্বালানির প্রকৃতি, সম্পূর্ণ দহনের জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ ইত্যাদি নিয়ে যেমন চলছে পরীক্ষানিরীক্ষা, তেমনি রাস্তায় বেরোনো মোটরগাড়ির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়েও চলছে নানারকম উদ্যোগ ও আলোচনা।

মোটরগাড়ির নির্গমনলে (exhaust pipe) বিশেষভাবে নির্মিত অনুঘটক শোষক (catalytic converter)-এর ব্যবহার পাশ্চাত্যের অনেক দেশে বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। সম্প্রতি ভারতেও বড় শহরে এগুলির কিছু কিছু ব্যবহার হচ্ছে। এই অনুঘটক শোষকটি গোলমুখ দণ্ডের আকারেই বেশি পাওয়া যায়— লম্বায় এক ফুটের মধ্যেই। এর ভেতরে সমান্তরালভাবে সজ্জিত অনেকগুলি সরু নলাকৃতির প্রকোষ্ঠে বিশেষভাবে তৈরি প্ল্যাটিনাম ধাতুর অনুঘটক মেশানো (impregnated) থাকে। নালিকা-প্রকোষ্ঠসহ দণ্ডটি ধাতুর হতে পারে, কিন্তু ইদানীং বিশেষ ধরণের সিরামিকের তৈরি কনভার্টারের কদর বেশি। বিপক্ষ কার্বন মনোক্সাইড এবং কিছু হাইড্রোকার্বন, অক্সিজেনের উপস্থিতিতে প্ল্যাটিনাম অনুঘটকের সংস্পর্শে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রাতেই (300-500°C) বিক্রিয়া করে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত হতে পারে। এর জন্য আলাদা করে তাপ দেবার প্রয়োজন পড়ে না, নির্গত গরম গ্যাসের তাপমাত্রাই বিক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট।

তবে এই যন্ত্রাংশটি এখনও সম্পূর্ণতই আমদানি করা হয় এবং ভারতে এর ব্যবহার খুবই সীমিত। কারণ এই কনভার্টার ব্যবহার করতে হলে সীসাযুক্ত পেট্রোল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার্য। সীসামুক্ত পেট্রোলও সম্পূর্ণই আমদানি করতে হয়। দামও বেশি, ভারতের পেট্রোলে এখনও সীসাঘটিত যৌগ মেশানো হয়, আর সীসা প্ল্যাটিনাম অনুঘটককে বিষিয়ে তুলে অচিরেই কনভার্টারকে অকেজো করে দেয়।

ক্যাটালিটিক কনভার্টার তৈরির উদ্যোগ কিছু কিছু নেওয়া হলেও ভারতে এখনও কার্যকরী কোনো কনভার্টার তৈরি হয় নি।

খ

জলীয় বর্জ্য শোধন (Aqueons Effluent Treatment) : কলকারখানায় (এবং অন্যত্র) নানাভাবে দূষকপদার্থ অঙ্গীভূত করে বেরিয়ে আসা দূষিত জলীয় (তরল) বর্জ্য প্রায়শই শোধন করা প্রয়োজন।

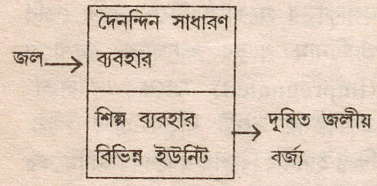

চিত্র 1

দূষিত জলীয় বর্জ্যের শোধন পূর্ণাঙ্গ করতে হলে অনেকসময় তিনটি পর্যায়ে করতে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে একটি বা দুটি পর্যায়েও শোধন সম্পূর্ণ হতে পারে।

প্রথম পর্যায়ে সাধারণত ভৌত প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। এতে সাধারণত অদ্রবীভূত ধুলোবালি, কঠিন পদার্থের কণা, তেল গ্রিজ ইত্যাদি দূর করা হয়। কখনও কখনও উত্তপ্ত করা, ছাঁকা, থিতানো ইত্যাদি প্রক্রিয়া যুক্ত করা প্রয়োজন। বিশেষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে চুন, ফটকিরি, ফেরিক সালফেট ইত্যাদিও মেশানো হয় ক্ষুদ্রতর প্রলম্বিত কণা পদার্থকে থিতিয়ে পড়তে সাহায্য করার জন্য। আম্লিক বা ক্ষারীয়-বর্জ্যের প্রশমীকরণও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অবশেষে থিতিয়ে বা ছেঁকে জল ও কঠিন পৃথক করা হয়।

প্রথম পর্যায় থেকে পাওয়া জলকে দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঠানো হয় প্রধানত জৈব-শোধনের জন্য (Biological Treatment)। দ্রবীভূত বা অতিক্ষুদ্র কণাগারে প্রলম্বিত জৈব-রাসায়নিক পদার্থকে প্রাকৃতিক নানারকম জীবাণু সহযোগে ভেঙে ফেলা বা জারিত করাই এই পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। 'পচনশীল' জৈব-পদার্থের জন্যই জলের অক্সিজেন চাহিদা (BOD) তৈরি হয়। এই পর্যায়ে তাই প্রধানত BOD দূরীভূত হয় বলা যায়। (*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*, জুলাই-সেপ্টে '95 দ্র.)।

নানারকম পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ঠিকই তবে তা মূলত দু-ধরণের — সবাত ও বায়ুহীন পদ্ধতি। বায়ু তথা অক্সিজেন-সহযোগে যে-সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, সেগুলির মূল কথা হলো উপযুক্ত জীবাণুর প্রয়োজনীয় সংখ্যায় সংখ্যাবৃদ্ধির কাজে সহায়তা করা এবং অক্সিজেন সরবরাহ অব্যাহত রাখা। অগভীর পুকুর ব্যবস্থা, সক্রিয় কর্দম (Activated sludge) ব্যবস্থা, চোঁয়ানো ছাঁকনী (Trickling Filter) ব্যবস্থা, ঘূর্ণায়মান জৈব-সংযোগ (Rotating Biological contactor) ইত্যাদি সবাত পদ্ধতির উদাহরণ। আজকাল বাতাসের পরিবর্তে বিশুদ্ধ অক্সিজেন ব্যবহার করে অনেক সবাত ব্যবস্থায় বেশি সুফল মিলছে।

অবাত বা বায়ুহীন ব্যবস্থার মধ্যে গভীর পুকুর এবং 'সেফটি ট্যাঙ্ক' ব্যবস্থা বেশি প্রচলিত। এই ব্যবস্থার বাড়তি সুবিধা — মিথেন-যুক্ত জ্বালানি গ্যাস তৈরি হওয়া।

কোথায় কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণীয় তা জলীয় বর্জ্যের প্রকৃতি, পরিমাণ এবং অন্যান্য নানা বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

প্রথম দুই পর্যায়ে যদি বর্জ্য জল যথেষ্ট পরিশোধিত না হয় তবে তৃতীয় পর্যায়ে তাকে আরও শোধন করতে হয়। সাধারণভাবে পচনশীল নয়, এমন সব জৈব-যৌগ (ফেনল জাতীয় যৌগ, ডিটারজেন্ট, পেস্টিসাইড ইত্যাদি), ধাতব লবণ, বিষাক্ত পদার্থ বা রোগজীবাণু — এইসব থেকে মুক্ত করার জন্য এই পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। রাসায়নিক পদার্থ যোগ করে জারণ বা অধঃক্ষেপন, সক্রিয় কার্বনে (Active charcoal) অবশোষণ ইত্যাদি পন্থা তো গৃহীত হয়ই। তবে এই পর্যায়ে ওজোন, হাইড্রোজেন পারাঅক্সাইড এবং অতিবেগুনি রশ্মির ব্যবহার বর্জ্য জলের অন্তিম শোষণে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। এইসব শক্তিশালী জারক পদার্থের ব্যবহারে অনেক ধরণের দূষক পদার্থ দ্রুত জারিত হতে পারে। বহু রকমফের আছে এগুলি ব্যবহারের, নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। সাধারণভাবে এইসব পদ্ধতি (যেখানে ওজোন, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ও অতিবেগুনি রশ্মি ইত্যাদি ব্যবহার করা

দ্বিতীয় তথা জৈব-শোধন পর্যায়ের মূল রাসায়নিক প্রক্রিয়া:

জৈব যৌগ + জীবাণু —অক্সিজেন→ কার্বন ডাই-অক্সাইড + জল

জৈব যৌগ + জীবাণু —অক্সিজেন ছাড়া→ মিথেন + হাইড্রোজেন সালফাইড + অ্যামোনিয়া ইত্যাদি।

মিথেন → জ্বালানি গ্যাস

চিত্র 2

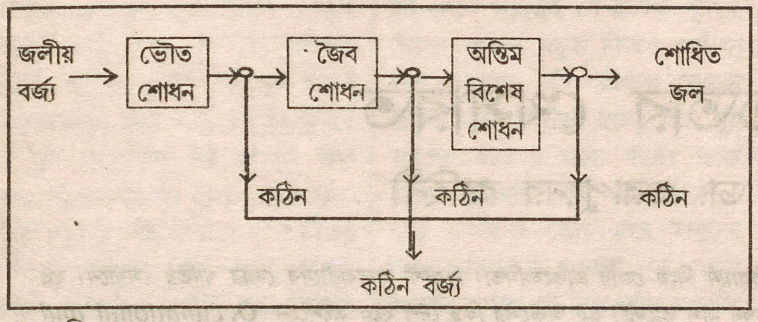

চিত্র 3

হয়) — 'উন্নত জারণ প্রক্রিয়া' নামে পরিচিত।

চিত্র ৩-এর সরল রেখা-ছকের সাহায্যে জলীয় বর্জ্যের শোধনকে প্রকাশ করা যায়।

গ

কঠিন বর্জ্য : শিল্প-বাণিজ্যের অনেক স্তরেই সরাসরি বর্জনীয় কঠিন পদার্থ তৈরি হয়। আবার গ্যাসীয় এবং জলীয় বর্জ্যের শোধন করার সময়েও কঠিন বর্জ্য জমা হয়। বহুক্ষেত্রেই এইসব কঠিন বর্জ্য সরাসরি যত্রতত্র ফেলে দেওয়া যায় না। পরিবেশ দূষিত না করে এইসব কঠিন বর্জ্যের সুষ্ঠু বিহিত করা রীতিমতো এক 'কঠিন' সমস্যা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব কঠিন বর্জ্যকে আবার শোধিত করা প্রয়োজন। জলীয় বর্জ্যের শোষণকালে যে-সব আধা-কঠিন বা আধা-তরল-কর্দম পাওয়া যায় সেগুলিকে শুকানো, বিষমুক্ত বা জীবাণুমুক্ত করা প্রয়োজন হতে পারে। শেষমেশ এইসব কঠিন বর্জ্যকে জমিতে ফেলা যায়, পোড়ানো যায়, কম্পোস্ট করে সার হিসেবে ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি।

বিশেষ বিশেষ বিপজ্জনক বিষাক্ত কঠিন বর্জ্যের ক্ষেত্রে (যেমন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য) এগুলিকে সিমেন্ট কংক্রিটের মধ্যে জমাট বাঁধিয়ে চিহ্নিত এলাকায় ফেলা বা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। বর্জ্যের সঙ্গে অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে গলিয়ে কাচে পরিণত করাও হয়। এসব ক্ষেত্রে কংক্রিট বা কাচ থেকে জল-জীবাণু ইত্যাদির প্রভাবে ধুয়ে প্রকৃতিতে মিশে যাবার সম্ভাবনা নির্মূল না করা গেলেও দ্রবীভূত হবার কারণে অত্যন্ত কমিয়ে ফেলা যায় ঠিকই, কিন্তু দূর-ভবিষ্যতে এগুলি কোথায় কিভাবে কতখানি বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, তা গভীর চিন্তার বিষয় থেকেই যায়।

আগ্রহী পাঠকদের জন্য কয়েকটি উৎস গ্রন্থ :

1. *Wastewater Enginering— Treatment, Disposal and Reuse,* Metcalf & Eddy Inc. (Tata McGrawhill edn.)
2. Rao & Dutta , *Wastewater Treatment*
3. J. W. Moore & Elizabeth A. More., *Environmental Chenistry.*

[দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত]

রবীন মজুমদার

গ্রাহকদের প্রতি

যাদের গ্রাহক চাঁদা ডিসেম্বর 1996 -এ শেষ হচ্ছে তাদের কাছে অনুরোধ — গ্রাহকপদ নবীকরণ করে নিন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা 20.00 টাকা (সডাক)।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী,
P 251 লেকটাউন ব্লক A, কলকাতা 700 089

সততার খেসারত

ডা. ওরাপুনের কাহিনী

দক্ষিণ এশিয়ার দেশে দেশে চলেছে শিল্পায়ন নিয়ে জোর প্রতিযোগিতা। বিদেশী কারবারীদের জোর খাতির সেখানে। যত অন্যায় অপরাধ করুন না তারা — সাতখুন মাপ তাদের। ওই অঞ্চলের কিছু দেশ ঘুরে এসেছেন 'Occupational and Environmental Health' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর কয়েকজন। তাদের অভিজ্ঞতার কিছু কিছু কথা জানাচ্ছেন পত্রিকার মাধ্যমে। সেই প্রতিবেদনগুলির একটি হলো 'Dr. Orapun Metadilogkul : a doctor with a mission' লেখাটি। লিখেছেন Harsha Jaitli। একজন কৃতি মহিলা চিকিৎসকের কাহিনী এটি। নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে গিয়ে কিভাবে সরকারি কর্তাব্যক্তির দ্বারা হেনস্থা হয়েছেন তার বিবরণ এটি। তাঁর অপরাধ হলো বিদেশী একটি কোম্পানির ত্রুটি ধরেছিলেন তিনি। তবে আনন্দের কথা ওপরওলার রক্তচক্ষু তাকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে নি। Harsh Jaitli-র এই প্রতিবেদন সংক্ষেপে প্রকাশিত হলো এখানে। শিরোনামটি অবশ্য এক রাখা হয় নি। ভাবানুবাদ করেছেন রবীন চক্রবর্তী। — সম্পাদকমণ্ডলী।

ডা. ওরাপুন মেটাডিলোগকুল পরিবেশ ও পেশাগত ব্যাধির চিকিৎসা ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ। থাইল্যাণ্ডে তাঁর বাস। সেখানেই লেখাপড়া করেছেন চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শিক্ষা অবধি। পরে বিদেশেও গেছেন উচ্চশিক্ষার্থে। দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো ছাড়াও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত তিনি। 1990 সালে থাইল্যাণ্ডের National Institute of Ocupational and Environmental Medicine এর ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হন। সেখানকার জনস্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীন এই সংস্থা। পেশাগত ব্যাধির বিশেষ চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয় এই সংস্থার ওপর। ডা. ওরাপুন কার্যভার নিয়েই এই কাজে হাত দেন।

কিছুদিনের মধ্যেই একটি গুরুত্বপুর্ণ কাজের দায়িত্ব এসে পড়ে এই সংস্থার হাতে। 1991 সালে ব্যাঙ্ককের কাছেই একটি কারখানায় চারশ কর্মী মারা যায় রহস্যজনক কারণে। বেশ কিছু কর্মী অসুস্থও হয়ে পড়ে। মৃত সব কর্মীদের রোগ-লক্ষণ প্রায় এক ধরণের ছিল। এই কারখানার নাম সিগেট টেকনোলজি কোম্পানি। এটি একটি বিদেশী কোম্পানি। এই কোম্পানির কারখানা চত্বরের কোনোরকম দূষণের কারণে এই মৃত্যু এবং অসুস্থতা হয়ে থাকতে পারে বলে অনেকের অনুমান। ডা. ওরাপুন তদন্ত শুরু করলেন।

এই সিগেট কোম্পানি খুবই প্রভাবশালী থাইল্যাণ্ডে। এর শেয়ারের দর খুবই চড়া। কোম্পানির ওপরতলার লোকজনের সরকারি আমলাদের ওপর বেজায় প্রতিপত্তি। ডা. ওরাপুন তদন্তে নেমে দেখলেন, মৃত চারজন কর্মীই প্রায় একই রকম অসুস্থতায় ভুগছিল। গায়ে ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা, অবসাদ এবং মাঝে মাঝে সংজ্ঞা হারানো — এই ছিল তাদের অসুবিধে। এদের বয়স বেশি নয়। সকলেরই বয়স কুড়ির কোঠায়।

কারখানার কর্মীদের ওপর কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান ডা. ওরাপুন। এদের রক্ত সীসার ভাগ নিরূপণ করেন তিনি। দেখতে পান যে, 36 শতাংশ কর্মীর দেহের রক্তে সীসার পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে বেশি। প্রতি একশ এম এল অর্থাৎ মিলিলিটার রক্তে কুড়ি মাইক্রোগ্রামের ওপর। 1991 সালের আগস্ট মাসে তিনি তাঁর তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করেন এবং কর্মীদের অসুস্থতার কারণ হিসেবে কারখানা চত্বরের নানা প্রকার দূষণকেই দায়ী করেন। তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলের নিরিখে তিনি জানান যে, ওই কারখানা চত্বরের সল্ডারিং সেকসন থেকে সীসার দূষণ ঘটে থাকতে পারে। সীসা ছাড়াও আরও কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের বাষ্প এই সেকশন থেকে ছড়ায় চারপাশে।

এখানকার কর্মীদের অর্ধেকেরই দেহে সীসার পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে বেশি। অথচ এখানকার সুপারভাইজার কিংবা কর্মীরা এ-সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহাল বলে মনে হয় নি তাঁর।

ডা. ওরাপুনের এই রির্পোট জমা পড়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের হাতে। তবে তারা গ্রহণ করেনি এই মতামত। কর্মীদের অসুস্থতা সীসার দুষণ থেকে হয়েছে বলে তারা মানেন নি। বরং সিগেট কোম্পানির বক্তব্য তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। এ ব্যাপারে ডা. ওরাপুনের মন্তব্য হলো — 'আজকাল মানুষের মৃত্যু-টিত্যুর কারণ ডাক্তারের চেয়ে রাজনীতিবিদ্‌রাই ভালো জানেন।'

এদিকে সিগেট কোম্পানি থেকে জানানো হয়, তাদের কারখানার কর্মীদের দেহের রক্তে সীসার পরিমাণ মোটেই বেশি নয়। এবং সরকার নির্দিষ্ট মাত্রার অধিক নয়। অন্তত এই ধরণের কারখানার জন্য যে উর্ধ্বসীমা বলা রয়েছে তার অধিক নয়। আসলে এর উর্ধ্বসীমা বলে যে-সব হিসেব দেওয়া আছে তা বড়ই গোলমেলে। এতে নানান ফাঁকফোকর রয়েছে। সেই ফোকর গলে বেরিয়ে যায় রাঘব বোয়ালরা। সিগেট কোম্পানিও এই সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং জানিয়েছেন তাদের কর্মীদের দেহে যেটুকু সীসার অস্তিত্ব ধরা পড়েছে তা তাদের কারখানা চত্বরের দূষণের জন্য নয়। এই সীসার উৎস ব্যাঙ্ককের রাস্তায় চলাচলকারী অটোমোবাইলের ধোঁয়া।

ডা. ওরাপুন অবশ্য এ-ব্যাপারে আগেই সাবধান হয়েছিলেন। তিনি ব্যাঙ্ককের পথের ধোঁয়া-ধুলো সম্পর্কে অবহিত। তিনি সেখানকার সাধারণ মানুষের রক্তের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এমন কি গাড়ির ধোঁয়া ধুলোয় সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত যে ট্রাফিক পুলিশ, তাঁদের রক্তের নমুনা নিয়েও পরীক্ষা করে দেখেছেন। এই পরীক্ষার ফলাফল থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত হলো এই দুই অংশের মানুষের মধ্যে যাদের রক্তে সীসার পরিমাণ প্রতি শত এমএল-এ কুড়ি এমজি-র বেশি এমন মানুষের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা দুজন এবং আটজন। ফলে এই কোম্পানির সল্ডারিং সেকশানের কর্মীদের বেশি অংশের রক্তে এই অধিক মাত্রার সীসার উৎস ব্যাঙ্ককের রাস্তায় চলাচলকারী গাড়ির ধোঁয়া-ধুলো হতে পারে না। অর্থাৎ এই সীসার উৎস কারখানা চত্বরেই খুঁজতে হবে।

এছাড়া অন্য বিষয়ের প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। যেমন তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে, কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য এক ধরণের মুখোশ বা মাস্কের ব্যবস্থা ছিল শুরুতে। শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে ধোঁয়া-ধুলো ফুসফুসে ঢোকা রোধ করতে। এই মাস্ক তৈরি হতো একধরণের টিস্যু-পেপার দিয়ে। পরবর্তীকালে সম্ভবত অর্থ-সাশ্রয়ের জন্য টিস্যু-পেপারের বদলে গজ-কাগজের তৈরি মাস্ক ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। এই মাস্ক আদৌ কার্যকর কিনা দেখা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছেন। বাড়তি উপার্জনের জন্য কর্মীদের মধ্যে ওভারটাইম কাজের প্রবণতাও বেড়েছে। ফলে অধিক সময় ধরে তাপের এই দূষিত আবহাওয়ায় থাকতে হচ্ছে। এসবের প্রভাবও পড়ে থাকতে পারে কর্মীদের স্বাস্থ্যের ওপর বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ডা. ওরাপুন বিশদ তদন্তের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে। তিনি এই কারখানার

'সিগেট টেকনোলজি' পরিচিতি

সিগেট টেকনোলজি আদতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোম্পানি। সিগেট টেকনোলজি (থাইল্যাণ্ড) কোম্পানি নাম দিয়ে থাইল্যাণ্ডে ব্যবসা শুরু করে 1982 সালে। শুরুতে কর্মী সংখ্যা ছিল মাত্র 60 জন। ব্যবসা অচিরেই ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং সাত বছরের মাথায় 1989 সালে থাইল্যাণ্ড জুড়ে তাদের কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় তিনটে। কর্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় আঠারো-শ-য়।

এই সিগেট গ্রুপ হলো পৃথিবীর সব থেকে বড় কম্পিউটার হার্ডডিস্ক নির্মাতা। তৃতীয়বিশ্বের দেশে কারখানা বসিয়ে সস্তা শ্রমের দৌলতে তাদের ব্যবসা চড়চড়িয়ে বেড়ে ওঠে। ফলে লাভজনক সংস্থা হিসেবে থাইল্যাণ্ডে এদের শেয়ারের দরও খুব চড়া। সিগেটের মূল কারখানা হলো কালিফোর্নিয়ায় স্কট্‌সভ্যালিতে।

থাইল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ঘটনায় একটু বদনাম হয়েছে এদের। লোকে বলছে — মুনাফা ছাড়া আর কিছু জানে না এই কোম্পানির পরিচালকরা।

অ্যাসেম্বলি-লাইন পরিদর্শনে গিয়েছেন একদিন। এই সময় একজন এসে তাঁকে খবর দেয় যে, তাঁকে ডিরেক্টরের ঘরে ডাকা হয়েছে। তিনি সেখানে পৌঁছে দেখতে পান, ডিরেক্টর টেলিফোনে কারো সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি ঘরে ঢুকলে ডিরেক্টর ভদ্রলোক ওই টেলিফোনটাই তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে কথা বলতে বলেন। টেলিফোন কানে লাগিয়ে ধরে তিনি জানতে পারেন, ওই প্রান্তে কথা বলছেন থাইল্যাণ্ডের একজন 'বিশিষ্ট' ব্যক্তি। শাসক রাজনৈতিক দলের একজন 'প্রভাবশালী' ব্যক্তি। ইনি প্রধানমন্ত্রীর একজন সচিব এবং সেখানকার 'বোর্ড অফ ইনভেস্টমেন্টের' ডিরেক্টর। তাঁর রাজনৈতিক প্রভাবের কথা সবাই জানে। তিনি ওপার থেকে শাসানির ঢঙে যা বলছিলেন তার মর্মার্থ হলো — ডা. ওরাপুন যা করছেন তা থাইল্যাণ্ডের স্বার্থের পরিপন্থী। তাঁর সিগেটের মতো একটি নামী কোম্পানির পেছনে লাগাটা খুবই দুঃসাহসের কাজ হয়েছে। এক্ষুনি বন্ধ না করলে, তাঁর চাকুরিটি তিনি খোয়াতে পারেন। এবং এটুকু করার মতো ক্ষমতা তার আছে তাও তিনি জানিয়ে দেন।

স্বভাবতই ডা. ওরাপুন স্তম্ভিত। এই ভাষায় কেউ কথা বলতে পারে সেটা তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু তিনি ভড়কে যাওয়ার পাত্রী নন। ফলে উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, এককথায় তার তুলনা হয় না এবং যে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত মানুষের পক্ষে তা দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি বলেছিলেন — 'আপনার অনেক ক্ষমতা থাকতে পারে, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমাকে আমার কাজ করতে দিন। আপনিও আপনারটা করুন।'

বুঝতেই পারা যাচ্ছে, উত্তরটা খুবই লাগসই হয়েছে। ফলে ওই ব্যক্তিকে তখনকার মতো কিল হজম করতে হয়। পরে এসব ব্যাপার জানাজানি হয়ে যাওয়ায় তিনি অস্বীকার করেন যে, তিনি এসব বলেছেন। তবে অস্বীকার করতে পারেননি যে, টেলিফোনের অপরপ্রান্তে সেদিন তিনিই কথা বলেছিলেন।

তবে তিনি যে ছেড়ে দেবার পাত্র নন তা বুঝিয়ে দেন অচিরেই, নানান কায়দায়। ঘটতে থাকে একের পর এক ঘটনা। প্রথমে ওই তদন্তের দায়িত্ব তুলে নেওয়া হয় ডা. ওরাপুনের এই সংস্থার হাত থেকে। এরপর ক্রমে এই সংস্থাকে অকেজো করে দেওয়া হতে থাকে। এবং অবশেষে ডা. ওরাপুনের নামে ছড়ানো হতে থাকে নানান কুৎসা। যেমন তিনি বড়ই 'খামখেয়ালি আমলা' ওঁর 'মাথার ঠিক নেই' ইত্যাদি। এই মস্তিক বিকৃতির রটনা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, তাকে এজন্য 'মেডিকেল টেস্ট'-এর মুখোমুখি হতে হয়। অবশ্য সে-পরীক্ষায় তিনি সুস্থ বলে জানানো হয়। ফলে তাকে বহাল রাখতে হয় কাজে।

ইতিমধ্যে তাঁর রিপোর্টের কথা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় কর্মীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তারা দূষণ প্রতিরোধের দাবিতে মার্কিন দূতাবাস এবং কারখানার অফিসের সামনে বিক্ষোভ জানায়। কর্তৃপক্ষ এতে রুষ্ট হয়ে ছাঁটাই করে 87 জন কর্মীকে। এতে অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পায়। ছাঁটাই কর্মীদের বহালের দাবিতে এবং তাদের ইউনিয়ন করতে দেওয়ার দাবিতে আরো বড় ধরণের আন্দোলনে সামিল হয় সব কর্মী। কারখানা কর্তৃপক্ষ এসব দাবি তো মানলই না বরং ছাঁটাই করল আরো 62 জন কর্মীকে। এর প্রতিবাদে কর্মীরা একদিন সরকারি অফিসের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ জানাল এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে আর্জি পেশ করল তৎকালে সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে।

এই অবস্থায় সরকার নতুন করে এই তদন্তের দায়িত্ব দিল এক 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাইজিন' বিশেষজ্ঞদলকে। এরা অবশ্য অচিরেই তাদের তদন্তের রিপোর্ট দাখিল করল এবং সিগেটকে সমস্ত রকম দূষণের দায় থেকে মুক্তি দিয়ে দিল। ইতিমধ্যে সিগেটের কর্মীদের আন্দোলনও থিতিয়ে এল। থিতিয়ে গেল ইউনিয়ন করার দাবিও। বরখাস্ত কর্মীদের কি হলো জানা যায় নি প্রতিবেদন থেকে।

এদিকে ডা. ওরাপুন কিন্তু তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। সিগেটের শ'-দুয়েক সীসার দূষণে আক্রান্ত কর্মী তাঁরই চিকিৎসাধীনে ছিল। Occupational and Environmental Health-এর সংস্থাটি আজও আছে ঠিকই, তবে তার গুরুত্ব অনেকখানি খাটো করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্তাব্যক্তিরা অস্বীকার করেন নি সে কথা। তবে তাদের অজুহাত হলো সিগেট-কারখানার ঘটনার পর শিল্পদূষণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি মোকাবিলার জন্য সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের দায়-দায়িত্ব একটু অন্যভাবে বণ্টন করা হয়েছে! অবশ্য বলে না দিলেও বুঝতে অসুবিধে হওয়ার নয় যে, কেন এই তৎপরতা। আসলে এ থেকেই বোঝা যায় কেন কিছু কিছু বিদেশী কলকারখানা নিজের দেশ থেকে তুলে নিয়ে অন্যত্র তৃতীয়বিশ্বের দেশগুলিতে নিয়ে বসানো হচ্ছে। ❑

পরিক্রমা

বিশ্বভারতীর আচার্য সঙ্কট

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদ ঘিরে বিতর্ক বেশ জমে উঠেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী হন ওখানকার আচার্য। এমন একটি প্রথা চালু হয়েছিল একসময়। সেই পঞ্চাশের দশকে বিশ্বভারতী যখন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ভুক্ত হয়। এই প্রথা চালু করার পেছনে ছিলেন ওখানকার কর্তাব্যক্তিরা। সেটাই এখন সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান আচার্যকে নিয়ে বেজায় ঝামেলায় পড়ে গেছেন তাঁরা।

বর্তমান আচার্যও একসময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন— যখন তিনি আচার্য মনোনীত হয়েছিলেন। তাই গোল ছিল না কোনো। গোল বেঁধেছে তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব গিয়েই। তাঁর মন্ত্রীত্ব গেছে, কিন্তু আচার্য পদ ছাড়েননি। আর স্বেচ্ছায় না ছাড়লে তাকে ছাড়ানোও মুশকিল। কারণ তেমন কোনো আইনী ব্যবস্থাও নেই। তিনি জানেন সে-কথা। 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া' হিসেবে জুটেছে অন্য আপদ। কেবল মন্ত্রীত্ব গেলেও হতো, একগুচ্ছ কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে তাঁর নামে। মামলা আদালত অবধি গড়িয়েছে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করবে আদালত। কিন্তু ক-দিনে ফয়সালা হবে মামলা কে জানে। ইতিমধ্যে কেচ্ছা নিয়ে গুলতানি আকাশ ছুঁয়েছে।

দেখে-শুনে বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছেন বিশ্বভারতীর লোকজন। প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নিয়ে টানাটানি। এমন একটি প্রতিষ্ঠানের মাথায় এহেন ব্যক্তির অধিষ্ঠান। ছ্যাঃ -ছ্যাঃ রব উঠেছে চারদিকে। অথচ করারও কিছু নেই। ফলে পরিস্থিতি অপরিবর্তিত। কেবল বিতর্কের ঝাঁজ বাড়ছে উত্তরোত্তর।

কিভাবে এমন একটা প্রথা চালু হয়েছিল সেটাই বিস্ময়ের। যখন চালু হয়েছিল এ-নিয়ে বিশেষ বির্তক উঠেছিল কিনা জানা নেই। দেশের প্রধানমন্ত্রী কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের নেতাই হবেন। একজন রাজনেতিক দলের নেতা কিভাবে একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে আসীন হন এ-প্রশ্নটা জাগল না কারো মনে? হোক না পদটি আলঙ্করিক। ব্যাপারটা কি খুব-ই বিসদৃশ নয়? — বোধহয় তেমন লাগে নি যখন চালু হয়েছিল প্রথা। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি হচ্ছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন অনেকে। এখন যদিও বলা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের কথা ভেবেই প্রধানমন্ত্রীকে তুষ্ট করার এমন ব্যবস্থা ফাঁদা হয়েছিল তখন।

এই ব্যবস্থায় অর্থ সমাগমের পথ কতখানি মসৃণ হয়েছিল জানা নেই, তবে কালক্রমে প্রধানমন্ত্রী-আচার্যের মোহটা যে কেটে গেছে বিশ্বভারতীর আবাসিকদের তা হলফ করে বলা যায়। বছরে একবার করে আচার্য পদধূলি দেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে— এমন একটা প্রথা আছে। একের পর এক প্রধানমন্ত্রী এসেছেন সেখানে। বদলাচ্ছে তাদের চাল চলন ঠাঁট-বাট। সে-সব বায়নাক্কা পোহাতে কর্তৃপক্ষের হিমসিম অবস্থা। অতি সম্প্রতিকালে এঁদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার নামে হুলুস্থুল কাণ্ডকারখানা হয় তা এক কথায় অসভ্যতা। এর জের পোহাতে হয় সেখানকার বিশিষ্ট-অবিশিষ্ট সকলকেই। ফলে এখন আচার্য আগমনের সংবাদ ওঁদের কাছে আতঙ্কের বিষয়। —কিছু ব্যতিক্রমী লোকজন ছাড়া। ফলে ওখানকার বেশিরভাগ সুস্থচিন্তার লোকদের কাছেই এই 'প্রথা'টি 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। অথচ মুখ ফুটে কথাটি বলতেও বাধে। —নানান কারণে। আড়ালে-আবডালে কখনও সখনও বলেন হয়তো। সুযোগ পেলে আচার্যের অনুষ্ঠান বয়কট করে প্রতিবাদ জানান নিঃশব্দে। কিন্তু বর্তমান আচার্যের প্রধানমন্ত্রীত্ব যেতেই রে রে করে উঠেছেন অনেকে। ওদিকে আচার্যও নাছোড়।

এই ফাঁকে বিতর্ক মোড় নিয়েছে অন্যদিকে। শুরুতে প্রশ্নটা ছিল — আচার্য কেন পদ ছাড়ছেন না প্রধানমন্ত্রীত্ব গিয়েও। এদিকে নতুন প্রধানমন্ত্রী এসেছেন। প্রার্থী হিসেবে তিনি অপেক্ষমান। এই ছিল প্রশ্ন। চরৈবেতি চরৈবেতি করতে করতে টনক নড়ে উঠেছে কারো কারো। চোখে পড়ছে আসল অসঙ্গতি। প্রধানমন্ত্রীকেই বা কেন হতে হবে আচার্য? দেশে কি জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতজনের এতই অভাব? এতদিনে কানে জল ঢুকেছে। বিতর্কটা ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এজন্য বর্তমান আচার্য-র কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত সকলের। তাঁর অনড় মনোভাবের জন্যই না এমনটা সম্ভব হলো। নচেৎ লজ্জায় পড়ে উনি যদি টুক্ করে পদত্যাগ করে বসতেন তাহলেই হয়েছিল আর কি। সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়তেন আরেক মহারথী। এঁর ওজন যতই কম হোক ওঁর পক্ষেও ওকালতি করার লোকের অভাব হতো না ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেই। ফলে আবার ঠিকঠাক চলতে শুরু করত সব। স্তিমিত হয়ে আসত বিতর্কের ঝড়।

কিন্তু বির্তক যখন থামে নি এবং এলোমেলো ছুটছে কথা এই সুযোগে প্রশ্ন তুলে রাখা যাক আরো একটা। প্রশ্ন হলো আচার্য পদটাই কি না রাখলে নয়? আলঙ্কারিক এই পদটি না থাকলে কি অচল হওয়ার সম্ভাবনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর? বিশেষকরে এমন ভারী অলঙ্কারে সাজানোর মতো অঙ্গের যখন এত অভাব।

ভেবে দেখতে অনুরোধ রইল সবার কাছে। প্রধানমন্ত্রীকে আচার্য হিসেবে দেখতে বড়ই অসুবিধে হচ্ছে অনেকের। ভালো কথা। কিন্তু বদলে যাঁরা রয়েছেন অথবা ভবিষ্যতে যাঁরা হবেন প্রথা-মেনে সেটাও কি হজম করার মতো? রাজ্যপালেরাই তো প্রথাগতভাবে

বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হন। রাজ্যপাল পদে যারা অধিষ্ঠিত হন তাঁরা কারা? অন্তত সম্প্রতিকালে যাঁরা হচ্ছেন তাঁরা? ধরুন, 'ঈশ্বর না করুন'—এ-রাজ্যের আজকের রাজ্যপাল বদল হয়ে নতুন একজন এলেন এবং তিনি হলেন উত্তর প্রদেশের বর্তমান রাজ্যপাল। —তাহলে? আর যদি এ-রাজ্যের ভাগ্য খুবই অপ্রসন্ন হয়, তিনি যদি হন আশির দশকে পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি শাসনকালের একজন এই রাজ্যবাসী রাজ্যপাল — তা হইলে, এ্যাঁ? র. চ.

নিউক্লিয়ার এনার্জির হাল হকিকৎ

এদেশ নিউক্লিয়ার এনার্জির হাল হকিকত খুবই সুবিধের নয়। এতদিন *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর* পাতায় এসব লেখা হতো বলে বেজার হতেন এখানকার অনেকে। এখন সাহেবরাও লিখছেন সে-কথা। এবং লিখছেন আমাদের থেকেও নির্মম ভাষায়। সম্প্রতি *বুলেটিন অফ অ্যাটমিক সায়েন্টিস্ট* পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন ড. এরিক আরনেট। ওঁর বক্তব্য খুব সরল। তিনি লিখছেন যে, ভারত এতদিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার নিউক্লিয়ার এনার্জির বিষয়টিকে সব থেকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। সেই নিউক্লিয়ার এনার্জির হাল এদেশে খুবই শোচনীয়। 'Catastropic'— অবস্থা। ভারতের বেশিরভাগ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের মুখ থুবড়ে পড়ার অবস্থা।

ড. আরনেট হলেন ইন্টারন্যাশানাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের 'প্রজেক্ট অন মিলিটারি টেকনোলজি' বিভাগের প্রধান। তিনি ইন্টারন্যাশানাল এটমিক এনার্জি এজেন্সি-র (IAEA) তথ্য উদ্‌ধৃত করে জানাচ্ছেন যে, এদেশের সব ক-টি রিয়াক্টর পৃথিবীর সব থেকে বিপজ্জনক রিয়াক্টরগুলোর অন্যতম। IAEA হলো বিশ্বের তাবৎ রিয়াক্টরগুলোর খোঁজ-খবর রাখার সংস্থা। এরা এই সমস্ত রিয়াক্টরের কাজকর্ম, তাদের সেফ্‌টি ব্যবস্থা ও পরিচালন পদ্ধতি ইত্যাদির হিসেব-নিকেশ করে এদের ভালো-মন্দের খতিয়ান বানায়। সেই খতিয়ান অনুযায়ী পৃথিবীর 399টি পাওয়ার রিয়াক্টরের মধ্যে সব থেকে নিচুমানের পঞ্চাশটির মধ্যে পড়ে আমাদের সব কটি রিয়াক্টর এবং তলের দিকে ছ-টির মধ্যে চারটির অবস্থানই আমাদের এই দেশে। এই গেল এর মানের প্রশ্ন।

অন্যদিকে আমাদের দেশের ন-টি পাওয়ার রিয়াক্টরের অর্ধাংশই প্রায় অকেজো থাকে বছরের অর্ধেক সময়। অর্থাৎ প্রচণ্ড ব্যয়বহুল এই সব পাওয়ার প্ল্যান্ট অকেজো থাকা মানে আর্থিক ক্ষতি কি পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। এর ওপর রয়েছে দুনিয়াজুড়ে এমন দুর্নাম। অথচ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নিয়ে বিতর্ক উঠলে এমন রে রে করে ওঠেন কর্তারা যে দেখে মনে হয় ওই প্ল্যান্টের উৎপাদন দিয়ে যেন উদর ভরাতে হয় সকাল বিকেল। না মিললেই সর্বনাশ!

সম্প্রতি একটি ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ভুল নয় — তিনি নিজেদের কিছু ত্রুটি স্বীকার করেছেন। অবশ্য চাকুরিতে থাকাকালীন সময়ে নয়, অবসর নেওয়ার পর। যাহোক এও কম নয়। কারণ এদেশের রেওয়াজ হলো চাকুরিতে থাকাকালীন ওপরলার চাটুকারিতা করার অজুহাত হলো চাকুরিতে উন্নতির আশা, আর চাকুরি শেষে চাটুকারিতা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্য হলো সরকারের ছোটোনো উচ্ছিষ্টের প্রলোভন। দু-চারটে কমিটি-কমিশনের সদস্যপদের আশায় হা-পিত্যেশ করে থাকা। — এই নিয়ে এন্তেকাল অবধি বিবেকের দোরে খিল এঁটে বসে থাকা। সম্প্রতি এর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বেজায় সাহস দেখিয়েছেন এদেশের নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি বোর্ডের বিদায়ী চেয়ারম্যান। তিনি কবুল করেছেন, যে আমাদের দেশের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোর মান সম্পর্কে যে অভিযোগ বাজারে চালু রয়েছে তার অনেকটাই সত্যি। এবং এনিয়ে এদেশের কর্তাব্যক্তিদের বিশেষ মাথাব্যাথাও নেই।

সেই কর্তা ব্যক্তিদের এই মন্তব্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তাদের বক্তব্য আরো মজার। ওঁরা এই অভিযোগ সম্পর্কে মুখ খুলতে চান নি। শুধু জানিয়েছেন যে, বিদায়ী চেয়ারম্যান আরেকবার পুনর্নিয়োগ পাওয়ার জন্য বিস্তর চেষ্টা-চরিত্তির করেছিলেন। কিন্তু সফল হন নি। এতেই ওনার গোসা হয়েছে। এসব উক্তি তারই প্রতিক্রিয়া! চমৎকার ব্যাখ্যা।

আরনেট সাহেবের সে বালাই নেই। তাই মুখ খুলেছেন। তিনি এমন সোজা-সাপ্টা কথা বলেছেন যে, মনে হবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের সাথে সামরিক অস্ত্রসজ্জারও সম্পর্ক রয়েছে! - বলে কি ভদ্রলোক? মাথা খারাপ নাকি? এদেশের নিউক্লিয়ার এনর্জির হাল হকিকত বুঝতে তিনি প্রতিরক্ষা-পরিকল্পনার নাড়ি টিপে দেখেছেন। দেখেছেন সেখানে ব্যয় বরাদ্দের হালচাল কোন্ দিকে গড়াচ্ছে। ওঁর আবিষ্কার চমকপ্রদ। তিনি দেখেছেন যে, সেই আটের দশকের শেষ থেকেই এদেশে বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণার ব্যয়বরাদ্দ কমেই চলেছে। অ্যাটমিক এনার্জির ক্ষেত্রে এই হ্রাসের হার আরো অধিক। এর ওপর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর জন্য বরাদ্দ অর্থও দেয়নি সরকার। ফলে পাওয়ার প্ল্যান্টের ভবিষ্যৎ ক্রমে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ কিন্তু কমেনি। সেখানকার বরাদ্দ অর্থ বেশি বেশি করে 'Conventional weapon' সংগ্রহের কাজে ব্যয়িত হচ্ছে।

এইসব দেখে শুনে তাঁর ইঙ্গিত যদি এই রকম হয় যে, ভারত ক্রমে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার উচ্চাশা থেকে সরে আসতে চাইছে, তাহলে তো বলতে হয় তাঁর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। কিন্তু তাও কি সম্ভব? অঢেল অর্থ নয়ছয় করার এমন মৌরসী পাট্টা ছেড়ে দেবে আমলা-প্রযুক্তিবিদ্-কন্ট্রাকটরকুল, তাও কি হয়? র.চ.

VIGNAN O VIGNANKARMI **Vol. XVIII No.4 OCT-DEC 1996 RN. No. 34929/79**

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী, P 252, লেকটাউন, ব্লক A, কলকাতা 700 089

গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন। কিছু কিছু পুরনো সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। প্রয়োজনে লিখুন।

লেখা পাঠান। সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্কের যে কোনো বিষয়ে। স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক রিপোর্ট, অনুসন্ধান, সমীক্ষা ইত্যাদি সাদরে বিবেচিত হবে।

এজেন্সি দেওয়া হয়। একসঙ্গে অন্তত পাঁচ কপি। কমিশন 25%।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি 117, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা 700009 থেকে মুদ্রিত। কম্পোজ : শিবা লেজার সেটার 89/1 গড়পাড় রোড কলকাতা 700009